দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যা
২৮ অক্টোবর, ২০২৪
১১ কার্তিক, ১৪৩১
যুগাব্দ - ৫১২৬

দীপাবলী সংখ্যা

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

দীপাবলী সংখ্যা

৭৭ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১১ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৮ অক্টোবর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

মমতা আর তাঁর বাম-বন্ধুদের টার্গেটে কেন সিবিআই?
'সবকটা জানালা খুলে দাও না' ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

সব ধর্মের খেলা হোক ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

ডেমোক্র্যাটিক আভিজাত্যবাদ বনাম রিপাবলিকান রক্ষণশীলতা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে মার্কিন গণতন্ত্র ☐ শেখর প্যাটেল ☐ ৮

ভারতের কূটনৈতিক দৌত্যে লাদাখে নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারত-চীন সংঘর্ষ মীমাংসার পথে ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

বাংলাদেশে জেহাদি শক্তির উত্থান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অশান্ত করবে ☐ অসিত চক্রবর্তী ☐ ১১

ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার আগে বাংলাদেশি জেহাদিদের দশবার ভাবতে হবে ☐ সেন্টুরঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ১৩

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন ☐ মিলন খামারিয়া ☐ ১৫

চিত্তরঞ্জন পার্কের শ্যামাপূজা ☐ অত্রি মল্লিক ☐ ১৭

বঙ্গদেশে কালীমাতার প্রভাব ☐ সাধ্বী সুমিত্রাম্বা (মিতা মা) ☐ ১৯

সাধক কবি কমলাকান্ত ☐ সরোজ চক্রবর্তী ☐ ২১

স্বামীজীর কালীভাবনার অনুসন্ধানে নিবেদিতা ও শরচ্চন্দ্রের লেখনী ☐ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ৩১

'ডুব দে রে মন কালী বলে' ☐ ড. রামানুজ গোস্বামী ☐ ৩৪

বিশ্বকল্যাণের সাধনায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কাজ করে চলেছে
☐ ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ☐ ৩৫

শ্যামপুকুরের মা ভবতারিণী ☐ সপ্তর্ষি ঘোষ ☐ ৪৩

দেবী কালিকা ☐ বাপ্পাদিত্য মাইতি ☐ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

প্রচ্ছদে গত বছর স্বস্তিকা কার্যালয়ে পূজিতা মা কালীর ছবি।

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, প্রচার প্রতিনিধি ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

—স্বস্তিকা পরিবার

প্রকাশিত হবে ৪ নভেম্বর, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৪ নভেম্বর, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

‘আ মরি বাংলা ভাষা’

সম্প্রতি বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। এই স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। জাতীয় স্তরে সাহিত্য অ্যাকাডেমির সদস্যদের নিরলস গবেষণা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই কাজটি সম্পন্ন হয়।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

যত্র বাঙ্গালি তত্র মা কালী

বলা হইয়া থাকে, যত্র বাঙ্গালি, তত্র মা কালী। মা কালী এবং মা দুর্গা অভিন্ন। বঙ্গের বাহিরে যেখানেই বাঙ্গালি রহিয়াছে, সেখানেও দুর্গাপূজা। মা কালীর আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হইয়াছে, দেবাসুরের সংগ্রামে পরাজিত দেবগণের স্তুতিতে আদ্যাশক্তি মা দুর্গার শরীর হইতে দেবী কৌশিকী আবির্ভূতা হন। তিনি কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় কালী বা দেবী কালিকা। মা দুর্গা কৌশিকী রূপেই শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুই অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। শাক্তমতে মা কালী হইলেন জগৎ প্রসবিনী। তাই তাঁহাকে নারীমূর্তিতে পূজা করিবার বিধান। তিনি অসুর নিধন করেন বলিয়া ভয়ংকরী। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মা কালীকে সংগ্রামের সাক্ষাৎ মূর্তি বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ভারতমাতার এক স্বরূপ হইলেন মা কালী। তিনিই দেশমাতৃকা। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য মা কালীর সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিতেন। কাজী নজরুল ইসলামও বৈদেশিক শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মা কালীকে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন সংগীতের মাধ্যমে— 'আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলা মূর্তি-আড়াল?' দানবদলনী, অশুভনাশিনী ভয়ংকরী কালীকেই বাঙ্গালি একান্ত আপনার করিয়া মাতৃমূর্তিতে সাধনা করিয়াছে। সংগীতের মাধ্যমে কালীসাধনা করিয়াছেন সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত। মাতৃভাবে সাধনা করিয়াছেন সাধক বামাক্ষ্যাপা, শ্রীরামকৃষ্ণ-সহ বহু সাধক-সাধিকা। কাজী নজরুলের শ্যামাসংগীত তো বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য মাত্রা প্রদান করিয়াছে। বঙ্গভূমিতে প্রতিমায় কালীপূজার প্রচলন কবে হইয়াছে তাহা লইয়া বিতর্ক থাকিলেও অনেকের মতে নবদ্বীপের কালীসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশই প্রথম মূর্তি নির্মাণ করিয়া কালীপূজা করেন। বঙ্গদেশে নানাপ্রকার কালীমূর্তির প্রচলন রহিয়াছে— দক্ষিণাকালী, বামাকালী, মহাকালী, চামুণ্ডাকালী, ফলহারিণীকালী, সিদ্ধকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, শ্যামাকালী, রণকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী ইত্যাদি। প্রতিটি মূর্তিরই ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে পূজা হইয়া থাকে। যে সাধক যে রূপেরই সাধনা করিয়াছেন, মা তাঁহার হৃদ্‌মন্দিরে সেই ভাবেই প্রকট হইয়াছেন। শক্তি সাধনায় তাঁহারা বঙ্গভূমিকে উদ্দীপিত করিয়াছেন। উজ্জীবন ঘটাইয়াছেন।

দীপান্বিতা অমাবস্যায় দুর্গাপূজার ন্যায়ই কালীপূজায় মাতিয়া ওঠে বাঙ্গালি। কালীপ্রতিমার রূপ এবং বসন-ভূষণের কোনো ব্যাখ্যা না জানিয়া অজ্ঞানী মানুষ বিরূপ সমালোচনা করিয়া থাকেন। অথচ শাস্ত্রে ইহার বহু ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী মন্দির দর্শন করিয়া ভাবে আবিষ্ট হইয়া 'কালী দ্য মাদার' (মৃত্যুরূপা মাতা) কবিতা লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি মা কালীর ভয়ংকরী রূপের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। কবিতাটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কবিতাটিকে ভারতের রূপরেখা ও কণ্ঠস্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বৈদান্তিক হইয়াও মা কালীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার শিষ্যা প্রখর যুক্তিবাদী হইয়াও মা কালীর রূপে আত্মহারা হইয়াছিলেন। রচনা করিয়াছেন 'মাতৃরূপা মাতা' নামক পুস্তক। ভারত-সংস্কৃতির বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যাহারা শুধু বিরোধিতা করিয়া থাকেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাদের মোক্ষম জবাব দিয়া বলিয়াছেন— 'ওই বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন এই দেশে চিরকাল। যদি পছন্দ না হয় সরে পড়ো না কেন?' শক্তিসাধনার পীঠস্থান দুই বঙ্গেই বাঙ্গালির আজ বড়ো দুর্দিন চলিতেছে। অসুরকুলের দাপাদাপি চলিতেছে। ভয়ংকরীর সাধনায় উজ্জীবিত না হইলে অসুর বিনাশ হইবে না, বাঙ্গালির দুর্দিন কাটিবে না, বঙ্গভূমিতে নৈরাজ্যের অবসানও ঘটিবে না।

সুভাষিতম্

অনাদরো বিলম্বশ্চ বৈ মুখ্যম্ নিষ্ঠুর বচনম্।
পশ্চতপশ্চ পঞ্চাণি দানস্য দূষণানি চ।।

দান দেওয়ার সময় অপমান করা, দেরি করে দেওয়া, মুখ ফিরিয়ে দেওয়া, দেওয়ার সময় কঠোর কথা বলা এবং দেওয়ার পর পশ্চাত্তাপ করা— এই পাঁচটি ক্রিয়া দানকে দূষিত করে।

মমতা আর তাঁর বাম-বন্ধুদের টার্গেটে কেন সিবিআই?

‘সবকটা জানালা খুলে দাও না’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘সবকটা জানালা খুলে দাও না। আমি গাইব বিজয়ের গান। ওরা আসবে চুপি চুপি। যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ।’ মোল্লাবাদী রাওয়ালপিণ্ডি রাজের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর বলিদানীদের উদ্দেশে ছিল এই গান। আরজি করের নারকীয় কাণ্ডের পর পশ্চিমবঙ্গেও এই গান প্রাসঙ্গিক। খানিকটা অন্যভাবে আর অন্যরূপে। আগামী মাসেই রাজ্যের ছ’টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভয়ার পাশবিক হত্যার বিচার চান নিজের মতো করে। তিনি অন্য বিচারের বিরোধী। সুপ্রিম আদালতে ২১ আইনজীবীর দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের পক্ষ সমর্থন করে তাদের তদন্ত প্রহসনকে আড়াল করা। জনগণের প্রশ্ন, আন্দোলনরত চিকিৎসকদের কোনো ট্র্যাক-২ রাজনৈতিক সমর্থন নেওয়া উচিত কি না?

রাজ্যপাটে লেখা হয়েছিল ‘পতাকা ছাড় মশাল ধর’। বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই পতাকাহীন আকর্ষণীয় মশাল মিছিল করেছেন। বিজেপি জানান দিতে চায় তারা চিকিৎসকদের আন্দোলনের পাশে আছে। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের মধ্যে কিছু প্রান্তিক আর বাতিল বিদেশি বামপন্থী ঢুকে পড়েছে। তাই বিজেপির দেওয়া মান্যতা আন্দোলনকারীরা কতটা গ্রহণ করবে সেটাই সন্দেহের। এখানেই আন্দোলনের দুর্বলতা। অনেকদিন আগেই রাজ্যের রাজনৈতিক ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত বিদেশি বাম, অতিবাম আর প্রান্তিক কংগ্রেস। আন্দোলনকারীদের তা বোঝা প্রয়োজন। আবেগ নিয়ে আন্দোলন শুরু করা যায়। শেষ করা যায় না। তাতে আন্দোলনের উপযোগিতা ক্ষুণ্ণ হয়। মমতা সেই আবেগকেই কাজে লাগিয়ে আন্দোলনরত ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রোগী ও সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করছেন। আবার কখনও ইনিয়ে বিনিয়ে দিদি সাজছেন বা মাতৃভাব দেখাচ্ছেন।

বাংলাদেশের রশি এখন ইসলামাবাদের হাতে। তেমন ‘চিকিৎসক আন্দোলনের চেইন’ও বামপন্থী উচ্ছিষ্টভোগীদের হাতে। আন্দোলন দুর্বল করে মমতার হাত শক্ত করা তাদের উদ্দেশ্য। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে মমতাকে জিতিয়ে সিপিএম গর্বিত। এক সর্বক্ষণের হেরো নেতা সান্ধ্য টিভির প্যানেলে বসে তাই বলেছেন। ‘ভোট কারো নয়’ এই অছিলাতে সিপিএম ১২টি লোকসভা আসনে মমতাকে জিতিয়েছে।

বাংলাদেশে গোদের উপর বিষফোড়া কিছু মার্কিন দালাল আর মধ্যস্থতাকারী। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতে এরা ‘ডিপ স্টেট’। মার্কিন সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে তারা গোপনে ভারত বিরোধী বাংলাদেশ গড়তে চায়। বাংলাদেশে নতুন করে লড়াই শুরু হয়েছে। সেই লড়াই হিন্দু নিধন আর ভারত বিরোধিতার বিরুদ্ধে। অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সেখানকার হিন্দু-সহ অমুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ রাস্তায় নেমেছে। ‘বাংলাদেশ’ হলো একটি দেশ। পশ্চিমবঙ্গের পাশের দেশ। তবে এখানে মমতা বিরোধী কোনো জোরদার ফ্রন্ট এখনও গড়ে ওঠেনি। তাতেই মমতা উদ্বাহু হয়েছেন। ন্যায় বিচারের আন্দোলনকে অন্তর্ঘাত করার জন্য মমতার বামপন্থী বন্ধুরা এই আন্দোলনে ভিড়ে গিয়েছেন। তাদের গুরুত্ব বাড়াতে মমতার পুলিশ তাদের এক কুচো যুব নেতাকে বিনা কারণে আটকও করে।

> **গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পচিয়ে দেওয়ার নাটের গুরু রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবালয় আর তাদের এক শীর্ষস্থানীয় অফিসার। বিষয়টি পূর্বতন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় এক ডাকসাইটে তৃণমূল নেতার নজরে এনেও আটকাতে পারেননি।**

আদালতে ভর্ৎসিত হলেও সিপিএমের ধ্বজা তুলে মমতা আনন্দ পান। আগেই লেখা হয়েছে গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পচিয়ে দেওয়ার নাটের গুরু রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবালয় আর তাদের এক শীর্ষস্থানীয় অফিসার। বিষয়টি পূর্বতন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় এক ডাকসাইটে তৃণমূল নেতার নজরে এনেও আটকাতে পারেননি। আন্দোলনকারীরা সঠিকভাবে স্বাস্থ্য সচিবের অপসারণ চেয়েছে। অপরাধ দু’ধরনের—নীল আর সাদা। নীল—খুন, হত্যা, ধর্ষণ, লুট ও প্রমাণ লোপাট। সাদা— মূলত অর্থনৈতিক জালিয়াতি এবং বেআইনি কারবার। তৃণমূলে নীল-সাদা দুটোই বিদ্যমান। অভয়ার ক্ষেত্রে মিশে যাওয়া দুটি রঙের তদন্ত করছে সিবিআই। তাই সুপ্রিম আদালত সিবিআই তদন্তের কোনো সময় বাঁধতে চায়নি। মমতা আর তার বাম বন্ধুরা সিবিআই-কে টার্গেট করেছে। তাদের দোষের ভাগী করছে। এটা লক্ষণীয় যে সিবিআই তদন্তের ব্যাপারে সিপিএম-মমতা এক সুর। তবে সারা দেশে সিবিআইয়ের কোনো বদলি বা তার থেকে ভালো তদন্ত সংস্থা না থাকায় অভয়ার তদন্তে তারাই যে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো হবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে আমার স্থির বিশ্বাস, সীমা পাহুজার তদন্তকারী দল আর তার অফিসাররা অভয়া হত্যা ও ধর্ষণের রহস্যজাল খুব শীঘ্র কাটবে। আমার কন্যা অভয়া বিচার পাবেই। □

সব ধর্মের খেলা হোক

লাইভপ্রিয়াযু দিদি,

পূজার পরে প্রথম চিঠি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রণাম, শুভেচ্ছা জানাতে হয়। তবে দিদি, বাকিদের মতো আপনাকে নয়। আপনার জন্য স্পেশাল— শুভনন্দনের কার্নিভ্যাল গ্রহণ করবেন।

দিদি, এটা ঠিক যে, উৎসবের আধিক্যই দুর্গাপূজাকে আর দশটা পূজার থেকে আলাদা করে। কিন্তু সেই উৎসব কখনও পূজার রীতিনীতিকে তোয়াক্কা না করে স্বেচ্ছাচারের রূপ নিতে পারে না বলেই আমার মনে হয়। তাই বিসর্জনের আগে করাত দিয়ে প্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করা যেমন বিসদৃশ, বিসর্জনের পরে রেড রোডে প্রতিমার কুচকাওয়াজ খানিকটা তাই। অবশ্য আপনার রাজ্যে আপনিই বেদ, বাইবেল, কোরান। তাই মা দুর্গারা আপনার সামনে আড়ালে আবডালে কুচকাওয়াজ করলেন। এই সুযোগে আপনার লেখা, সুর দেওয়া, গাওয়া গানটি রাজ্যজুড়ে ভাইরাল হয়ে গেল। সেটিকে আপনার সরকার আবার পূজার সেরা গানের তকমাও দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দিদি, ওই গান শুনে লোকে যা সব বলছে তাতে আমার রাগই হচ্ছে।

আসলে আপনি দুর্গাপূজাটাকে নিয়ে যেভাবে ছেলেখেলা করে চলেছেন বছরের পর বছর, তাতে যে কোনো হিন্দুরই রাগ হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা হয় না। আসলে হিন্দুরা অনেকেই নিজের স্বাভিমান নিয়ে চিন্তিত নয়। এমনকী, নিজে যে হিন্দু সেটাই ভুলে যায়। আর আপনি যা খুশি করে চলেছেন। আচ্ছা দিদি, এবার একটা নতুন খেলা হোক। আপনার ভাষায় 'খেলা হবে'।

শুনুন না, সামনেই তো বড়দিন আসছে। যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন। আপনি যেমন মহালয়ার আগেই পূজার উদ্বোধন করে দেন তেমন করে নভেম্বরই বড়দিন হয়ে যাক না। আর দুর্গাপূজাকে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা যেমন শারোদৎসব বলেন, তেমন করে শীতোৎসব হয়ে যাক নামটা। বড়দিনে মাদার টেরেজার সংস্থাকে বলুন না, একটা কার্নিভ্যাল করতে। কে কত বড়ো যিশু বানাতে পারে তার প্রতিযোগিতা। আর আপনার সব মন্ত্রী মানে সুজিত বসু, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস ইত্যাদিকে বলুন না একটা করে যিশু পূজা করতে। সেখানে আপনি উদ্বোধনে যাবেন, যিশুর চোখ আঁকবেন। দারুণ হবে দিদি! ভয় পাচ্ছেন? ভয় আছে। কারণ, সংখ্যাগুরু হিন্দুরা বলবে,

> আসলে আপনি দুর্গাপূজাটাকে নিয়ে যে ভাবে ছেলেখেলা করে চলেছেন বছরের পর বছর, তাতে যে কোনো হিন্দুরই রাগ হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা হয় না। আসলে হিন্দুরা অনেকেই নিজের স্বাভিমান নিয়ে চিন্তিত নয়।

আমাদের পূজা নিয়ে খেলা হোক, অন্য ধর্মে হাত কেন দিদি?

আরও একটা কথা আমার মাথায় রয়েছে। মুসলমানদের পবিত্র রমজান মাসটা নিয়েও তো কিছু করতে পারেন। ধরা যাক, বেশি কিছু নয়, রমজানোৎসব নামটাই দিলেন। মাস শুরুর ক'দিন আগে থেকেই উৎসব শুরু করে দিলেন। চলবে ইদের পরেও। সম্ভব দিদি? সম্ভব নয়? কেন বলুন তো? সবার আগে হিন্দুরাই বলবেন, আমাদের পূজা নিয়ে যা খুশি হোক মেনে নেব কিন্তু সংখ্যালঘুদের কিছু করা ঠিক হবে না। তার পরে আপনি যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের তাজিয়াকে বলে দেন রেড রোডে প্রতিযোগিতার মতো করতে, পুরস্কারও ঘোষণা করেন, তবেও কিন্তু দিদি হিন্দুরাই প্রতিবাদ করবে সবার আগে।

বিসর্জনের পরেও শোভাযাত্রায় মা দুর্গার অংশগ্রহণ— শুনলাম অনেক বেশি বিদেশি মানুষ দেখেছেন এবার। তাঁরা আপনার লেখা আড়ালে আবডালে গানের সঙ্গে নাচ দেখেছেন, গানটাও শুনেছেন। আপনার নাচও দেখেছেন। আমি চাই দিদি, বছরে একবার নয়, বড়দিন, রমজানেও এমন উৎসব হোক কলকাতায়। জমিয়ে উৎসব হোক। দিনরাত উৎসব হোক। আর একটা কথা দিদি। আপনি এর পরের বারে যখন কোনও উৎসব করবেন তখন নিয়ম করে দিন রাজ্যের সব মানুষকে নীল-সাদা ইউনিফর্ম পরে থাকতে হবে। দেব-দেবীদের রংও আপনিই ঠিক করে দিন বরং। শিল্পীদের সুবিধা হবে। কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। আপনার রাজত্বে আমি কারও স্বাধীনতা চাই না সবাই পরাধীন হয়ে যাক। সব ধর্ম। সব মানুষ। শুধু হিন্দুদের উদ্‌যাপন করার সুযোগ কেন দেবেন দিদি? দুধেল গাইদের কথা একটু ভাবুন। □

অতিথি কলম

শেখর প্যাটেল

এক শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন আজ মার্কিন গণতন্ত্র। সাম্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য নীতিগত অবস্থানের পুনর্মূল্যায়ন এবং আগামী দিনে কোন পথে তাদের চলা উচিত সেই বিষয়ে যুযুধান দু'টি দলের মতাদর্শগত পর্যালোচনা তাই আজ সময়ের দাবি।

ডেমোক্র্যাটিক আভিজাত্যবাদ বনাম রিপাবলিকান রক্ষণশীলতা

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে মার্কিন গণতন্ত্র

আমেরিকার ইতিহাসে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির উদ্ভবের পরবর্তী অধ্যায়ে এই দলটির রাজনৈতিক বিবর্তনকে কেন্দ্র করে রূপান্তরিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের নেতৃত্বে এই দলটির পথ চলা শুরু। প্রথম দিকে দলটি হয়ে উঠেছিল অভিজাত সমাজের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর। দলটির রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সাধারণ মানুষের স্থান ও গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। কিন্তু সময় যত এগোতে থাকে ততই তাদের এই রাজনৈতিক পরিচিতির গুণগত পরিবর্তন হতে থাকে। একদা সাধারণ মানুষের পক্ষে থাকা দলটি আজ হয়ে উঠেছে 'প্রগতিশীল'। রাজনৈতিক চরিত্রগত পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি সাম্প্রতিক অতীতে আমেরিকান অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব বজায় রাখার স্বার্থে সমাজের নানা ফাঁকফোকর, ত্রুটিবিচ্যুতিকে কাজে লাগিয়ে থাকে এই অভিজাত বা এলিট শ্রেণী। বর্তমানে এলিটদের দ্বারা পরিচালিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টি মার্কিন সমাজে ক্রমবর্ধমান আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার সব রকম প্রচেষ্টায় লিপ্ত। আজ মার্কিন শাসক দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যখন ক্যানসেল কালচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে (অর্থাৎ, মূল সংস্কৃতিকে বর্জন করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে), তখন বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টির গলায় ধনীদের স্বার্থরক্ষার সুর শোনা যায়। ধনীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্য রেখে চলা বিরোধী দলটিও হয়তো মার্কিন সমাজে বিদ্যমান আর্থিক অসাম্যের একটি অন্যতম কারণ।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাজনৈতিক বিবর্তন : ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তৈরি হওয়ার পরে পথ চলার শুরুর সময়টায় একটি 'পপুলিস্ট' পার্টি হিসেবে দলটি পরিচয় লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে ঘটে যায় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। ১৯৩০-এর দশকে আমেরিকায় আসে 'নিউ ডিল' বা নতুন আর্থিক ব্যবস্থার যুগ। বেহাল আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মার্কিন অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রয়োজনীয় সংস্কারের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট। আর্থিক সংস্কার প্রক্রিয়ার দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এই ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট। তাঁর আমলে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচির দ্বারা আর্থিক মন্দা পরিস্থিতি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে আনার পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে বেকারদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এরপর, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসে ১৯৭০-এর দশক। এই সময় প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের অধীনে প্রবলভাবে নিও-লিবারাল (নব্য-উদারপন্থী) নীতি গ্রহণ করে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। উদারতাবাদী পথে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই যাত্রা শুরুর দরুন মার্কিন মুলুকে ফুটে ওঠে এলিটিজম্ বা আভিজাত্যবাদের একটি নতুন রূপ। এই তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের পরতে পরতে মিশে রয়েছে মডার্ন এলিটিজম্ বা আধুনিক আভিজাত্যবাদ। সামাজিক ন্যায়বিচারের আওয়াজ তুলে সেই প্রতিধ্বনির আড়ালে তাদের চিরাচরিত আধিপত্যকে বজায় রাখতে তৎপর এলিট শ্রেণীর তরফে প্রয়োগ হয়ে চলেছে নানা কলাকৌশল এবং রাজনৈতিক চাল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের মতো ইস্যুকে রাজনীতির তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার ও ঢাল করে তাদের ক্ষমতা ও প্রভাবকে দীর্ঘস্থায়ী রাখার বন্দোবস্তকে একটি মরাল ক্রুসেড বা নীতিগত সংগ্রাম হিসেবে তুলে ধরে এই 'প্রগতিশীল' চিন্তাধারা। বর্তমানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, বিশেষত এর মধ্যে থাকা 'প্রগতিশীল' অংশটি 'উওকনেস' বা জাগ্রত বামপন্থায় পুরোপুরি জারিত। সামাজিক ন্যায়ের কথাবার্তা আওড়ে চলা এই দলটি আজ কার্যত বিত্তশালী, এলিট সম্প্রদায়ের কবজায়।

বাক্‌স্বাধীনতার অন্তর্জলি যাত্রা : সামাজিক মাধ্যম-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের প্রকাশ্যে আক্রমণ, অসম্মান, কটূক্তি ও বিষোদ্গারের মাধ্যম তাদের হীন প্রতিপন্ন করা, সমাজের মূলস্রোত থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার বামপন্থী প্রবণতা 'ক্যানসেল কালচার' হিসেবে পরিচিত। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বর্তমানে এই ক্যানসেল কালচারে আক্রান্ত। ভিন্নমতকে উপড়ে ফেলে, তাদের সমালোচকদের দমন করে ক্ষমতা জাহিরের লক্ষ্যে অভিজাত শ্রেণী কতখানি সক্রিয়, ক্যানসেল কালচারের দিকে এই দলটির ক্রমাগত ঢলে পড়া তার প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করে। সমাজে সব স্তরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে তাদের হাতিয়ার এই তথাকথিত প্রগতিশীল আদর্শ। ভুল তথ্যের মোকাবিলার মুখোশের আড়ালে ফেসবুকের মতো সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি এলিট ন্যারেটিভ (অর্থাৎ প্রভাবশালীদের বক্তব্য)-কে খণ্ডন করে ছড়িয়ে পড়া লেখাগুলিকে সেন্সর করতে বা আটকে দিতে সদা ব্যস্ত। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদমূলক কথাবার্তা, লেখালেখি নিষিদ্ধ করার

কার্যকলাপ চলছে অবিরত। এরই একটি উদাহরণ হলো— ফেসবুক সেন্সরশিপ ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক। ২০২০ সালে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে জো বিডেন পুত্র হান্টার বিডেনের একটি ল্যাপটপ সংক্রান্ত বিতর্ক ফেসবুকে সেন্সর করা এবং তার পাশাপাশি অন্যান্য ঘটনা সেন্সর করার ক্ষেত্রে ফেসবুকের ভূমিকা-সহ তাদের যাবতীয় অপকর্মের বিষয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন মেটা (পূর্বতন ফেসবুক)-র সিইও মার্ক জুকারবার্গ। এই সেন্সরশিপের পক্ষে সাফাই হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়টি। পরবর্তী অধ্যায়ে যখন ল্যাপটপ সংক্রান্ত ঘটনাটির সত্যতা সামনে আসে, তখন মিথ্যে তথ্যের বিরুদ্ধে ফেসবুকের লড়াইয়ের সেই আখ্যান বাস্তবে তথ্য চেপে দেওয়ার ক্ষেত্রে ফেসবুকের দেওয়া একটি অজুহাত বলে প্রমাণিত হয়। জনমতকে প্রভাবিত করতে সক্ষম, সেইরকম তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে নানা মহল। একদা বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারের পক্ষে সোচ্চার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই চরিত্রগত পরিবর্তন, পরম্পরাগত উদারনৈতিক মূল্যবোধের পথ থেকে সরে গিয়ে ক্রমাগত বাক্‌স্বাধীনতা খর্ব করার কুটিল রাজনীতি— সৃষ্টি করেছে একটি ভয়, সংশয় ও বিশ্বাসহীনতার পরিবেশ।

সামাজিক বিভাজন : জাতি, লিঙ্গ, গাত্রবর্ণ এবং যৌন মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচয়গত বিভাজনের রাজনীতি বা আইডেন্টিটি পলিটিক্সে জোর দেওয়ার বিষয়টি এলিটদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একটি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য। সমাজ ও প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষেত্রে এলিট শ্রেণীর অন্যতম অস্ত্র হলো এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শ্রেণীবিভাজন। ঐক্য বিধানের পরিবর্তে সমাজের এই বাঁটোয়ারার মাধ্যমে সামাজিক বিভাজনের সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। বৃহত্তর আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি থেকে নজর ঘোরানোর সঙ্গে ক্ষমতাবানদের পাল্লা ভারী করে রাখতে মদত দেয় এই রণকৌশল। স্থিতাবস্থা ধরে রাখার পাশাপাশি 'নিপীড়িতদের মসিহা' রূপে আবির্ভূত হতে প্রভাবশালীদের পক্ষে পরোক্ষে সহায়ক হয় এই বিভাজনের রাজনীতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমেরিকার স্কুলগুলিতে ক্রিটিকাল রেস থিয়োরির পাঠদানের কারণে উদ্ভূত সাম্প্রতিক বিতর্ক। স্কুলগুলিতে এই ধরনের ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক তত্ত্বের পঠনপাঠন সম্প্রদায়গত বিভাজনকেই ত্বরান্বিত করে চলেছে। তত্ত্বটির প্রবক্তা ও সমর্থকদের তরফে সাজানো যুক্তি অনুযায়ী এই তত্ত্ব হলো জাতিবিদ্বেষের সমস্যার সমাধান। এই তত্ত্বের বিরোধীদের অভিযোগ যে এই তত্ত্বটিই সামাজিক বিভাজন, জাতিভেদ ও বর্ণবিদ্বেষের মূল কারণ। জাতিগত ঐক্য এবং পারস্পরিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে জাতিভেদের বিষবৃক্ষকে ডালপালা মেলতে সাহায্য করে এই তত্ত্ব। সমালোচকদের বক্তব্য হলো যে এই তত্ত্ব আমেরিকাকে একটি জাতি ও বর্ণবিদ্বেষী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে। মার্কিনিদের জাতিবিদ্বেষী হিসেবে তুলে ধরা এই তত্ত্ব অধ্যয়ন করলে শ্বেতাঙ্গদের লজ্জিত হওয়া এবং নিজেদের দোষী মনে করা স্বাভাবিক।

বিদেশনীতি প্রণয়নেও দ্বিচারিতা : পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাটদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের দ্বিচারী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবী জুড়ে 'গণতন্ত্র' বিকাশের ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার কথা মার্কিন কূটনীতিকরা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করলেও, বিভিন্ন দেশের নানা ক্ষেত্রে তাদের অযাচিত নাক গলানোর ঘটনা ডেকে আনে ভয়াবহ বিপর্যয়। এই ব্যাপারে লিবিয়ায় ওবামা প্রশাসনের হস্তক্ষেপের উদাহরণ রয়েছে। লিবিয়ায় তাদের হস্তক্ষেপকে 'লিবিয়ার গণতন্ত্র রক্ষার মিশন' হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুলে ধরলেও তার পরিণামে লিবিয়া জুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই দেশের মানুষ অশেষ দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন দেশের বাজার দখল থেকে শুরু করে ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের দ্বারা বিশ্বব্যাপী এই অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থই হলো দেশগুলিতে মার্কিনি হস্তক্ষেপের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিডেন প্রশাসনের জমানায় আফগানিস্তান থেকে বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। ফলে তালিবান জেহাদিরা সেই দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে। তালিবানি শাসনে দুর্বিষহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন আফগান মহিলারা। শেষ হয়ে যায় তাদের সুরক্ষা ও স্বাধীনতা। প্রশ্ন হলো, সেনা প্রত্যাহার করার ফলাফল সম্পর্কে কি অবহিত ছিল না আমেরিকা? আফগান মেয়েদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অধিকার কি পশ্চিমি দেশগুলির মেয়েদের চেয়ে কোনো অংশে কম? 'গণতন্ত্র' কি আফগান সমাজের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়?

সমাজ পরিবর্তন প্রতিরোধে রিপাবলিকান রক্ষণশীলতা : ডেমোক্র্যাট প্রগতিশীলতার বিপ্রতীপে, আমেরিকান পরম্পরা ও মূল্যবোধ রক্ষার স্বার্থে মার্কিন রিপাবলিকান পার্টি ক্রমাগত একটি প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে। বর্তমানে এই বিরোধী দলটি সাধারণ মানুষের পক্ষ নিয়ে রাজনীতি বা জনমোহিনী নীতির পথে হেঁটে কিছুটা 'পপুলিস্ট' হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে তাদের গলায় শোনা যাচ্ছে জাতীয়তাবাদের সুর। এই কারণে আমেরিকার রাজনৈতিক পটভূমি জুড়ে মেরুকরণ প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিপদ সংকেত : রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান এই দলটিরও রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের উদাহরণস্বরূপ। মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের মতো বিষয়ের প্রতি যে রিপাবলিকান দল একদা অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। ট্রাম্প জমানায় সেই নীতিগুলি থেকে সরে এসে 'আমেরিকা ফার্স্ট' এজেন্ডা রূপায়ণে জোর দেয় মার্কিন প্রশাসন। রিপাবলিকানদের তরফে এই 'সর্বাগ্রে আমেরিকা' নীতি প্রণয়ন তাদের পূর্ববর্তী নীতি পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক স্তরে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পরিবর্তে সব ক্ষেত্রে মার্কিন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দানের রাজনীতি রিপাবলিকান পার্টির নীতিগত অবস্থান পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরে।

আর্থিক নীতি, ক্রমবর্ধমান অসাম্য, সামাজিক উন্নয়নের গতিরোধ : ২০১৭ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে পাশ হওয়া ট্যাক্স কাটস্ অ্যান্ড জবস্ অ্যাক্ট আইনটি পাশ হয়। এই আইনের বলে কর্পোরেট করে হার কমে যায় এবং ধনীরা লাভবান হয়। মার্কিন সমাজে নানাভাবে বেড়ে চলেছে আর্থিক অসাম্য। গোঁড়া ও রক্ষণশীল মার্কিনিদের প্রতিনিধিত্ব করা রিপাবলিকান পার্টির নীতির কারণে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যায় একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যার ফলে সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় মেরুকরণ ও বিভাজন। ডেমোক্র্যাটরা যখন 'উওকনেস্' বা বামপন্থী চিন্তাধারাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রিপাবলিকানদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ মার্কিন রাজনীতির কেন্দ্রটিকে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু করে তুলছে। সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে সামাজিক সংহতির ভারসাম্য। একই সঙ্গে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক স্বচ্ছতা; ব্যক্তিগত অধিকারের পাশাপাশি সমষ্টিগত, যৌথ দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বিধানও বিশেষ প্রয়োজন। এক শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন আজ মার্কিন গণতন্ত্র। সাম্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য নীতিগত অবস্থানের পুনর্মূল্যায়ন এবং আগামী দিনে কোন পথে তাদের চলা উচিত সেই বিষয়ে যুযুধান দু'টি দলের মতাদর্শগত পর্যালোচনা তাই আজ সময়ের দাবি।

(লেখক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর কালচারাল স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট)

ভারতের কূটনৈতিক দৌত্যে লাদাখে নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারত-চীন সংঘর্ষ মীমাংসার পথে

রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিত ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) সম্মেলনে এবার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় কি প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় সংঘাত নিয়ে ভারত-চীনের দ্বিপাক্ষিক কথোপকথন? অন্তত শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অনুমান তেমনই। এই সংবাদ যখন স্বস্তিকার পাতায় ছাপা হবে, তখন সকলে নিশ্চিতভাবেই জেনে যাবেন দু'দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব মুখোমুখি বসেছিলেন কিনা। আপাতত জ্যোতিষীর এই ভূমিকার বাইরে গিয়েও বলা যায়, ভারতের সফল কূটনৈতিক দৌত্য নিয়ন্ত্রণরেখায় পারস্পরিক সংঘাত নিয়ে ভারত চীনের বৈঠকের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছে। বিষয়টি নিয়ে অবহিত ভারতের এক আধিকারিকের মতে, এই সংঘাত নিয়ে ভারত ও চীন ঐকমত্যে পৌঁছানোর ফলে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস সম্মেলনে মুখোমুখি হচ্ছেন মোদী এবং জিনপিং।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের দাবি অনুযায়ী, সাড়ে চার বছর আগে যেখানে ছিল ভারত ও চীনের বাহিনী, সেখানেই ফিরে যাওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের এই বিষয়টি নিয়ে আপাতত চীনের তরফে সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ওই বছরের এপ্রিল-মে-তে পূর্ব লাদাখে ভারত ও চীনের মধ্যে যে সংঘাত শুরু হয়েছিল, তারপর থেকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) বরাবর একাধিক জায়গা নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি জায়গায় সমাধানসূত্র মিললেও কয়েকটি এলাকা নিয়ে সমস্যা ছিলই। যদিও শেষপর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমেই ২০২০ সালে ভারত ও চীন যেখানে ছিল, সেখানেই ফিরে গিয়েছে নয়াদিল্লি ও বেজিং। এই দাবি করে 'এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড সামিট'-এ ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, 'টহলদারি নিয়ে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি। আমরা ২০২০ সালের জায়গায় চলে গিয়েছি। আর সেটার সঙ্গে আপনারা বলতে পারেন যে চীনের সঙ্গে সেনা সরানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে।'

ওই অনুষ্ঠানে ভারতের বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, 'এমন কয়েকটি জায়গা ছিল, যেখানে ২০২০ সালের পরে ওরা (চীন) আমাদের আটকে দিয়েছিল। আমরা ওদের (চীন) আটকে দিয়েছিলাম। এখন আমরা এমন একটা ঐক্যমত্যে পৌঁছেছি যেটার ভিত্তিতে ২০২০ সাল পর্যন্ত আমরা (ভারত এবং চীন) যেখানে টহল দিত, সেখানেই দেবে।' বিশেষজ্ঞরা একে ভারতের 'ধৈর্যশীল কূটনীতির জয়' হিসেবেই দেখতে চাইছেন। কিন্তু এতদিন ধরে যে সংঘাত চলছিল, সেটার কীভাবে সমাধান হলো? পুরো বিষয়টির পিছনে কূটনৈতিক অধ্যবসায় আছে বলে দাবি করেন জয়শঙ্কর। ওই শিখর সম্মেলনে ভারতের বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, '(আলোচনার) বিভিন্ন স্তরে লোকজন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিল। আমরা সবসময় একটা জিনিস বলে এসেছি যে একদিকে আমাদের পালটা বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। আর আমরা ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আলোচনা করছি। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে পুরো প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদিও যতটা জটিল হওয়ার কথা ছিল, তার থেকেও বেশি কঠিন ছিল পুরো পরিস্থিতি।'

প্রায় পাঁচ বছর পরে লাদাখ সীমান্তে জট কেটে যাওয়ার ভারতের কূটনৈতিক ও সামরিক মহলেও স্বস্তির হাওয়া। কারণ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর টহলদারি নিয়ে ভারত ও চীন ঐকমত্যে পৌঁছেছে বলে নয়াদিল্লির তরফে অন্তত এটুকু জানানো হয়েছে। আর সেটার ভিত্তিতেই সেনা সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয় বলে সূত্রের খবর। গত ২১ অক্টোবর ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরি বলেছেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে আলোচনা চলেছে, সেটার ফলস্বরূপ ভারত-চীন সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা নজরদারি নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে দু'দেশ।' সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ওই ঐক্যমতে পৌঁছানোর ফলে সেনা সরিয়ে নেওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছিল আর তার ফলেই ২০২০ সালে পূর্ব লাদাখ সীমান্তে যে সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল, এতদিনে তার মীমাংসাসূত্র মিললো বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি।

ডেপসাং ও ডেমচক নিয়েই কি মিললো সমাধানসূত্র? সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডেপসাং ও ডেমচক এলাকা থেকে টহলদারি ঘিরে ভারত এবং চীন ঐকমত্যে পৌঁছেছে। যে দুটি জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সংঘাত চলে আসছে।

> চীনকে টেক্কা দিতে গেলে শুধু কূটনৈতিক ক্ষেত্রেই শক্তিশালী হলে চলবে না, সামরিক ক্ষেত্রেও ভারতকে শক্তি প্রদর্শন করতে হবে।

গত সেপ্টেম্বরেই সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল যে পূর্ব লাদাখে ডেপসাং ও ডেমচক এলাকায় সংঘাত এখনও মেটেনি। অবশেষে ওই দুটি সংঘাতের জায়গায় সমস্যা মিটতে চলেছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

তবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, চীনকে টেক্কা দিতে গেলে শুধু কূটনৈতিক ক্ষেত্রেই শক্তিশালী হলে চলবে না, সামরিক ক্ষেত্রেও ভারতকে শক্তি প্রদর্শন করতে হবে। □

বাংলাদেশে জেহাদি শক্তির উত্থান ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অশান্ত করবে

অসিত চক্রবর্তী

ভারতের শান্তির ইজিচেয়ারে বসে বসে যারা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখছেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে চোখ বুলাচ্ছেন, আর ভাবছেন, এসব বাংলাদেশের ব্যাপার। আমরা তো বেশ আছি। তাদের ধারণা ভুল। এটা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় ভাবলে ভুল হবে। বাংলাদেশের এই জঘন্য ঘটনাগুলো ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ের উপর শ্বাস ফেলছে।

বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা ভারত সিল করে দিয়েছে। কড়া সতর্ক বিএসএফ। বাংলাদেশ থেকে যেন একটা মাছিও ঢুকতে না পারে। সবাই ভাবছে, আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। মনে রাখতে হবে, এই বাংলাদেশ আর সেই বাংলাদেশ নয়। বিষদন্তহীন বাংলাদেশ নয়, সে আজ বিষাক্ত কেউটে। জেহাদি মোল্লাবাদীদের বিষদংশনে জর্জরিত বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অলিতে গলিতে এইসব কেউটেদের ফোঁসফোঁসানি।

বাংলাদেশের অস্থিরতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে উত্তর পূর্বাঞ্চল। এইতো সেদিন বিএসএফ-এর নজরদারি এড়িয়ে অসমে ঢুকলো ক'জন বাংলাদেশি। সবাই ভেবেছিল তারা মুসলমানদের নির্যাতনে পালিয়ে আসা হিন্দু শরণার্থী হবে। কিন্তু পুলিশের জেরায় জানা গেল, তারা মুসলমান। বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্প লাটে উঠায় তারা ভারতে কাজের সন্ধানে এসেছে। এটা কতটুকু সত্য কে বলতে পারে? তাছাড়া আরও কতজন বাংলাদেশি মুসলমান এসে ঢুকেছে তাই-বা কে জানে! কী তাদের মতলব? শুধুই কি কাজের সন্ধানে না নতুন করে ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলিকে শক্তি জোগাতে এসেছে এরা! একবার দেখা যাক। আসলে ঘরপোড়া হিন্দু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।

ভয় পাওয়ার মতো কারণ অনেক। বাংলাদেশে চলছে যথার্থ অর্থে নৈরাজ্য। জেহাদিদের পদভারে কাঁপছে গোটা দেশ। দেশটা চালাচ্ছে জামাত। ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গকে নিশ্চিহ্ন করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে হাত মিলিয়ে তারাই রক্তস্নাত করে বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালের হিংসা ও রক্তপাতের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান। লক্ষ্য একটাই, বাংলাদেশে উগ্র ইসলামিরাজের প্রতিষ্ঠা। ওয়াহাবিজমের লক্ষ্য জেহাদি পোষণ ও ভারতের মাটিতে বিস্তার করা। এদের চালিকাশক্তি হিসেবে পেছনে আছে আইএসআইএস এবং একিউআইএস।

উত্তর পূর্বাঞ্চলকে কেন বেছে নিল মোল্লাবাদীরা? কারণ হিসেবে ভাবা হয়, কাশ্মীরে পাকিস্তানি উগ্রবাদীদের গতিবিধি ভারতীয় সেনার নজর এড়িয়ে এখন চালানো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সমস্ত করিডোর ও নেটওয়ার্ক এখন ভারতের নজরদারিতে। উগ্রবাদীদের আশ্রয়দানকারী গ্রাম এমনকী পরিবারগুলিও ভারতীয় সেনার নখদর্পণে। কোনো চালাকি করার সুযোগ নেই। তাই জম্মুর দিকে এখন হামলা চালাচ্ছে পাকিস্তানি উগ্রবাদীরা। সেদিকেও প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাদের। ভারত কড়া নিরাপত্তাবলয় তৈরি করে ফেলছে সেদিকেও। স্বভাবতই নজর ঘুরিয়ে দিতেই সেভেন সিস্টার্স-এর দুর্গম এলাকায় সন্ত্রাসী কাজ করতে চাইছে ইসলামিক জেহাদিরা। তাদের সহায়কের ভূমিকায় থাকবে বাংলাদেশের জেহাদিরা, মোল্লাবাদীরা এবং তাদের কট্টর সমর্থক ভারতীয়রা।

> **বাংলাদেশের ইসলামিক জঙ্গিপনা বরাকের মাটিতে শেকড় গাড়ার অপেক্ষায় আছে। পুষ্ট বীজ, সার (অর্থ) আসবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে। তাই বাংলাদেশের ঘটনা অন্য দেশের ঘটনা ভাবলে মহা ভুল হবে।**

এদের পাশাপাশি বাংলাদেশে জেহাদি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এইচইউজেআই বা হুজি। সংগঠনটি মাদ্রাসাগুলিতে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক বিস্তার করে ভারতের মাটিতেও পাকাপোক্ত ঘাঁটি গেড়েছে। ভারতের মাটিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। মুসলমান তরুণদের কাম বাসনাকে উসকে দিয়ে, প্রজনন ক্ষমতা ব্যবহার করে, মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে, ইসলামের চাষ করে ভারত দখল করা তাদের আরেকটি লক্ষ্য। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে অসম ও নাগাল্যান্ডে এই

ফঃ ২

গোষ্ঠীর প্রায় ৪০টির মতো স্লিপার সেল কাজ করছে।

হিজবুত তাহরির আরেকটি ইসলামিক মোল্লাবাদী গোষ্ঠী। এটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে কার্যকলাপ চালাচ্ছে। এছাড়াও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদের মধ্যে পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশের ছাত্র ও সামরিক বাহিনীর মিলিত অভ্যুত্থান নতুন কিংবা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। ভারতের চারপাশেও এভাবেই একটি ইসলামিক চক্র কাজ করছে। ভারতকে অস্থির করে তোলাই তাদের লক্ষ্য। চারপাশে থাকা ইসলামিক দেশগুলির আর্থিক ও সামরিক ক্ষমতা দুর্বল হলে কী হবে। চীনের অস্ত্র সাহায্য এইসব জেহাদি সংগঠনকে বাহবা দিচ্ছে। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা দখল করতে সংখ্যালঘু তোষণ ও সংবিধানের সেকুলারিজমের সুযোগ নিয়ে মোল্লাবাদীদের চোরাস্রোত ভারতে বইছে। ভারতের কিছু রাজনৈতিক দল তাদের মদত দিচ্ছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ খ্রিস্টান ও ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অবাধ বিচরণ ভূমি। পার্বত্য ক্ষেত্র, বিভিন্ন জনজাতির বাসস্থান এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা এই অঞ্চলকে উগ্রবাদীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। এই বিভিন্নতার মধ্যেই তারা বিচ্ছিন্নতাবাদের সুযোগ খুঁজছে।

সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত এই অঞ্চলটি যথার্থই সাংস্কৃতিক মোজাইক। আহোম, বোড়ো, কোচ, রাজবংশী, সাঁওতাল, মিশিং, ডিমাসা, কুকি, নাগা ইত্যাদি বহু জনজাতি এই অঞ্চলে বসবাসরত। তাদের বিভিন্ন ভাষা, আলাদা আলাদা সংস্কৃতি ও উপাসনা পদ্ধতি। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা বাসস্থান এলাকা। যা শহরাঞ্চল থেকে বহু দূরে এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এসব অঞ্চল দখল করে ঘাঁটি গেড়েছে। সহজ সরল জনজাতি মানুষের তাদের উদ্দেশ্য বোঝার কথা নয়। এভাবেই এসব অঞ্চলে একদিন চার্চ গড়ে উঠেছিল। চার্চ ও ইসলামের একই উদ্দেশ্য থাকায় এক যৌথ পরিকল্পনাও চোখে পড়ে। কুকি-চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কে এন এফ) একটি সশস্ত্র খ্রিস্টান গোষ্ঠী। এই সংগঠনটি মুসলিম জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকিয়ার সঙ্গে যুক্ত। তারা দুটি ভিন্নমতের কট্টর উগ্রবাদী সংগঠন হলেও পারস্পরিক সুবিধার জন্য একযোগে কাজ করছে। আবার মণিপুরে ক্রমবর্ধমান অশান্তির পেছনে রয়েছে এসব মিত্রতারই কালো ছায়া।

এভাবেই কেআইএ নামক বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনটি বহুদিন ধরে উত্তর-পূর্বের সমস্ত উগ্রবাদীদের সহায়তা করে আসছে। মণিপুরের প্রাক্তন গভর্নর ভি কে নায়ারের মতে— 'কেআইএ এবং এনএসসিএন দ্বারা আলফাকে অর্থ প্রদান, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদানের নিশ্চিত তথ্য-প্রমাণ রয়েছে।'

পিএলএ এবং নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে আলফা ও এনএসসিএন বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ছাতা সংগঠনও তৈরি করেছে যার নাম ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব সেভেন সিস্টার্স (ULFSS)। এখানেই শেষ নয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অশান্ত করতে এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন টাইগার্স-এর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। যার প্রাণকেন্দ্র হলো বাংলাদেশ। অসমে এই ইসলামিক সংগঠনটি কাজ করছে ইসলামিক লিবারেশন টাইগার্স অব অসম নামে। গোয়েন্দাদের হাতে পড়া তাদের লিফলেটে লেখা ছিল, তারা নাকি অসমের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলো এবং বাংলাদেশ নিয়ে বৃহত্তর ইসলামিকস্তান বানাতে চায়।

১৯৯০ সাল থেকে বাংলাদেশে আলফার কয়েকটি প্রশিক্ষণ শিবির বহাল তবিয়তে চলছিল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, সিলেট ইত্যাদি অঞ্চলে তারা বেশ কিছু লাভজনক প্রকল্প শুরু করে। এর মধ্যে নরম পানীয় উৎপাদন, হোটেল, ক্লিনিক, মোটর ড্রাইভিং স্কুল ইত্যাদি কিছু মিথ্যা কিন্তু লাভজনক প্রকল্প ছিল। সিলেট ও কক্সবাজার এলাকায় আইএসআই পরিচালিত বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা ও মসজিদে আলফার ডেরা ছিল। যেখানে থাইল্যান্ড ও মায়ানমার থেকে অস্ত্র আসত। এ সম্পর্কে অসম বিধানসভায় পেশ হওয়া ও আলোচিত বিস্তারিত রিপোর্টে ছিল— আইএসআই ও আলফার ঘনিষ্ঠতা। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসলে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের চাপে পড়ে আলফাকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে হয়।

বাংলাদেশে আজ হাসিনা সরকার নেই। ইসলামিক উগ্রবাদীদের আস্ফালনে কাঁপছে গোটা বাংলাদেশ। আইএসআই এখন বাংলাদেশে শক্তিশালী। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলোর সলতে যখন নিভে যাচ্ছিল, তখন বাংলাদেশের ইসলামিক সংগঠনগুলির মদতে সেগুলো অচিরেই জেগে উঠবে, এতে সন্দেহ নেই। সেভেন সিস্টার্স-এর জন্য এ এক অশনিসংকেত। অর্থাৎ অশান্ত হতে চলেছে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চল।

বাংলাদেশের অস্থিরতার সুযোগে শয়ে শয়ে বন্দি জঙ্গিরা কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছে। শুধুমাত্র শেরপুরের কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে পাঁচশোর বেশি জঙ্গি। যারা অধিকাংশই হুজি, জেএমবির সদস্য। ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চল জুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ বিস্তারের এরা এক একজন সক্রিয় সেনা। তাই বৃহত্তর ইসলামিকস্তান গড়ার পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে ঢাকা ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

অসমে ভাষিক সংঘর্ষ আবার মদত পাবে। ইসলামিক চক্রান্তে বাঙ্গালি-অসমীয়া ভাষিক সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি আসবে। আগের ইতিহাসের শিক্ষা এটাই। তখন অসমীয়া সেজে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মুসলমানরা বাঙ্গালিদের বিরুদ্ধে অসমীয়াদের বিষিয়ে তুলেছিল। বরাক উপত্যকা ইসলামিক মোল্লাবাদীদের উর্বর ক্ষেত্র। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিন্দু নির্যাতনের পর এরা প্রকাশ্যে কিন্তু চুপচাপ, অন্তরে কী অন্য কথা? বাংলাদেশের ইসলামিক জঙ্গিপনা বরাকের মাটিতে শেকড় গাড়ার অপেক্ষায় আছে। পুষ্ট বীজ, সার (অর্থ) আসবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে। তাই বাংলাদেশের ঘটনা অন্য দেশের ঘটনা ভাবলে মহা ভুল হবে। পশ্চিমবঙ্গের মতো অসমের ঈশান কোণে আজ তাই কালো মেঘ পুঞ্জীভূত। □

ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার আগে বাংলাদেশি জেহাদিদের দশবার ভাবতে হবে

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

ভারতের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পরে দেশটির তথাকথিত সুশীল সমাজের অনেকের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফুটে উঠেছে মুখ ও মুখোশ। তাদের মধ্যে আহ্বান করা হয়। কালবিলম্ব না করে তিনি চলে আসেন দেশে। ভালো ভাবে বোঝা গেছে তিনি আগেই সেটা জানতেন এবং তৈরিও ছিলেন। ঢাকা বিমান বন্দরে নেমেই তিনি প্রথমে ভারত-বিরোধী মন্তব্য করলেন। ভারতের বিরুদ্ধে মেতে উঠলেন। সারা তুলে নিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্তর্বাস নিয়ে পৈশাচিক উল্লাস, তাঁর খাটে শুয়ে গান, কিনা করেছে তারা। অবস্থা দেখে মনে হলো এ যেন এক মানবতার বিপর্যয়। জাতীয় সংসদে ঢুকে সেকি উল্লাস, যা অবর্ণনীয়। পরবর্তীতে যা ঘটেছে এবং এখনো

অনেকেই সে দেশের স্বাধীনতাকে মন থেকে মেনে না নিয়ে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্রের গোপন সুড়ঙ্গ কেটেছেন। সে সুড়ঙ্গপথ ধরে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর সকল শত্রু সমবেতভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। চোরাগোপ্তা এই গভীর পরিকল্পনার আঁতুড়ঘর চীন, পাকিস্তান ও আমেরিকা। এই তিনটি আঁতুড়ঘরে লালিত হয়েছে স্বাধীনতার শত্রুরা। ভারতকে অশান্ত করাই ছিল তাদের অন্তরে লালিত স্বপ্ন। বাংলাদেশে অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত ও নগ্ন পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশটির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নোবেল বিজয়ী ড. ইউনুসকে বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন ভারতের সেভেন সিস্টারকে তিনি অশান্ত করে তুলবেন। তার এ কথায় বেরিয়ে পড়ল ঝুলি থেকে কালো বেড়াল। আসলে শেখ হাসিনা নয়, ভারতকে ডিসটার্ব করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

উগ্র মোল্লাবাদী নগ্নতা দেখিয়ে সে দেশের জেহাদিরা তাদের চরিত্রের প্রমাণ দিল। চুরি, ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণের মতো অপরাধকে অঘোষিতভাবে জাতীয়করণ করা হলো। বিশ্ববাসী চেয়ে চেয়ে মেধাবীদের নগ্নতা উপভোগ করলো। গণভবনে ঢুকে গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, মাছ যে যার মতো ঘটে চলেছে সেটি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। দেশটাতো উচ্ছন্নে গেছেই, এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ এবং নির্মম প্রতিশোধের পালা। সম্প্রতি দেখা গেছে কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত কর্মকাণ্ডও শুরু হয়েছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের অধ্যাপক যার জন্ম আওয়ামি লিগের গর্ভে, তিনি সীমাহীন মিথ্যাচার করে টক-মিষ্টি-ঝাল কথা বলতে শুরু করেছেন। ভারত বিরোধিতা করতে পারলেই যেন বীরত্ব বেড়ে যায়। এই মূর্খ অধ্যাপক কাণ্ডজ্ঞানের মাথা খেয়ে বললেন বাংলাদেশে নাকি ২৬ লক্ষ ভারতীয়

চাকুরি করে। তাকে অনেকেই চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন তার একটা লিস্ট প্রকাশ করতে। এইভাবে মিথ্যাচার করে দেশটির নির্বোধ জনসাধারণকে বিভ্রান্তিতে ফেলা অব্যাহত রেখে ভারতকে বিষিয়ে তুলছে।

অতি সম্প্রতি দেশটির পরিচালনা পর্ষদের আশকারায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরাকে নিয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের মতো দেশের এক কণা বালি ধারণ করার শক্তি যাদের নেই তারা নাকি ভারতের ভূখণ্ড কেড়ে নেবে। এটি পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। প্রশ্ন হলো, এ স্পর্ধার উৎস কোথায়? বড়ো ভাইদের আশকারায় যদি ভারতের দিকে চোখ রাখে সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ যে অন্ধ হয়ে যাবে সেটা কি এই পাগলেরা জানে না? ভারতকে নিয়ে তাদের ব্যস্ততা এতই বেশি যে নিজ দেশ গোল্লায় যাচ্ছে তাতে কী? ভারত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই হবে। আসলে তারা জানে না তাদের মতো মূর্খের দেশ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। সম্প্রতি এও শোনা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে দেশ ত্যাগ করতে পেরেছেন কিন্তু এই মেধাবীরা পালাবার সময়ে রিক্সা ভ্যানও পাবেন না।

ভারতকে নিয়ে বাংলাদেশি মূর্খদের ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। ভারতের পণ্য বর্জন, ভারতের ভূখণ্ড কেড়ে নেওয়ার স্বপ্নের উৎস অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। মনে এলে মুখে বলে ফেলা কিংবা করে ফেলার চেষ্টা পশুদের মধ্যে দেখা যায়। বাংলাদেশে কি তাহলে সেই ধরনের পশুর আধিক্য বেড়ে গেছে? কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রতি একজন নাটের গুরুকে আমরা অনেকেই জেনেছি। তিনি যে দেশেই পদার্পণ করেছেন সে দেশেই ধ্বংসের আগুন জ্বলেছে। ডোনাল্ড লু তার নাম। আমেরিকার নাগরিক। পেশায় কূটনীতিক। এক কথায় নষ্টের গুরু। শুধু ভারতে এসে দাঁত ফোটাতে পারেননি। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালে সফলতা পেয়েছেন। তিনি এর মধ্যে ভালো করেই জানতে পেরেছেন যে ভারত মানে ভারতই। বেকুব বাংলাদেশের ললিপপ মুখে ঢুকিয়ে তিনিই কলকাঠি নাড়াতে শুরু করেছেন। সঙ্গে রেখেছেন কিছু কেনা গোলাম। গোলামরা কর্তার কথামতো কিছু করতে কালবিলম্ব করে না। বাংলাদেশের জানা উচিত ভারত বিরোধিতা কখনো তাদের জন্য মঙ্গল ডেকে আনবে না। ভারতে ইসলামিক মোল্লাবাদের কাল শেষ হয়েছে সেটা তাদের জানা নেই। ভারত তার শক্তির পরীক্ষা দিতে চায় না। কিন্তু বাধ্য হলে পরীক্ষাটা সময় মতো দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে বর্তমান যে সরকার চলছে তা অনেকটাই নাচের পুতুলের মতো। তারা শুধুই নাচবে পুতুল মাস্টারের অঙ্গুলির নির্দেশে। আমেরিকা সফলভাবেই দেশটাকে ঘোলাটে অবস্থায় নিয়ে যেতে পেরেছে। শেখ হাসিনাকে ম্যানেজ করতে না পেরেই তারা এই চরমপন্থা অবলম্বন করেছে। আর যাই হোক, হাসিনা সরকার দেশটাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। সেটা আমেরিকা ও চীনের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমেরিকার চোখ ছিল সামরিক ঘাঁটি তৈরি করে ভারত ও চীনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা। আর চীনের চোখ হলো পুঁজি বিনিয়োগ করে দেশটাকে শ্রীলঙ্কার মতো দেউলিয়া করে দেওয়া। মাঝখানে শেখ হাসিনা দেউলিয়া হওয়ার আগেই আমেরিকা গুটির চাল খেলে দিল। আমেরিকা সামরিক ঘাঁটি করতে চেয়ে এখন দারুণভাবে উল্লসিত। সম্ভাব্য স্থান ছিল সেন্ট মার্টিন। এরই মাঝে সেখানে আমেরিকার কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। তারই অংশ হিসেবে সেখানে পর্যটকদের যাতায়াত সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। এমনকী সেখানে যেতে চাইলে এখন পর্যটকদের আগে রেজিস্ট্রেশন করে পরে ভ্রমণ ফি জমা দিতে হবে। দৈনিক পর্যটক সংখ্যাও কমিয়ে মাত্র ১২৫০ করা হয়েছে। মেধাবীদের এবার যদি টনক নড়ে। দেশের ভিতরে দেশ। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে এমন আরও উন্মুক্ত ব্যভিচার এবার বিশ্ববাসী দেখবে। এবার লু আসবেন বিরাট আর্থিক প্যাকেজ নিয়ে। সে প্যাকেজ চোখ বন্ধ করে গিলে নেবে তারা। আজকে যারা পুতুল নাচ নেচে চলেছেন তাদের করুণ পরিণতি এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

শোনা যাচ্ছে, ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সুয়ারেজ অথরিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাকসেম খানকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। আসলে আমেরিকা এ সকল কাজে ইদানীং হাত পাকিয়ে ফেলেছে। শ্রীলঙ্কার স্টাইলে বাংলাদেশেও ওই একই চক্র কাজ করছে। অবশ্য একটা কথা এখানে বলে রাখা খুবই প্রাসঙ্গিক। লুয়ের সফরের সময়ে বাংলাদেশে দরবেশ বলে বহুল পরিচিত আর্থিক কেলেঙ্কারির নায়ক এবং প্রধানমন্ত্রীর খাস লোক সালমান এফ রহমানের সঙ্গেও লুয়ের কথা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল শেখ হাসিনা তা শোনেননি। শুনে থাকলেও দরবেশ হয়তো হাসিনাকে মিথ্যা বলেছিলেন। বুঝতে দেননি প্রধানমন্ত্রীকে। শোনা যাচ্ছে এই দরবেশ পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই'-এর খাস লোক। তার অফিসে পাকিস্তানিদের অনেকে চাকুরি করতেন। আওয়ামি লিগ নেত্রী সেটা কেন যে আমল দেননি তা এক চিন্তার বিষয়।

লু এবং আমেরিকার পুঁজি হলো মুসলমান সংখ্যাধিক্য। ভারতের সেভেন সিস্টারে ৭৫ শতাংশ অমুসলমান। আমেরিকা নানা ধরনের সমীকরণে পাকা। মণিপুর ও মিজোরাম বাদে সকল রাজ্যেই মুসলমানদের একটা সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। তারা বসে নেই। অসমে আজমল কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন মুসলমানদের জন্য। মুসলমানরা যাই ভাবুক, হিন্দুদের দেশে সেটা কতটুকু বাস্তব সেটাও সময় বলে দেবে। জেহাদি মুসলমানরা ভাবছে হিন্দুরা ঠুনকো। কিন্তু জেনে রাখা ভালো যে, হিন্দুরা উগ্র নয় কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য যা করণীয় তাতে কালক্ষেপ করবে না। গোবিন্দ প্রামাণিকের মতো ব্যক্তি, যিনি কিনা সবশেষে হিন্দুদের কাছে মিরজাফর বলে পরিচিতি পেয়েছেন তাকেও পুঁজি করেছে আমেরিকা। বাজারের বলদের মতো বিক্রি হয়ে গিয়েছেন তিনি। বিক্রয়যোগ্য এইসব অপদার্থ পশুরা যুগে যুগে ছিল বর্তমানেও আছে। আছে আরও, কিন্তু সে সকল প্রাণীদের মুখোশ ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। ষড়যন্ত্র করে ভারতের বিরুদ্ধে কিছু করা এবং চিকেন নেক দখল করা হবে বলে যে ঢোল বাজানো হচ্ছে তা তাদের স্বপ্নই থেকে যাবে। □

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন

মিলন খামারিয়া

সুপ্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে শাক্ত চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে শাক্তধারা আবার নতুন করে বিকশিত হয়। আঠারো শতকে মোগল শাসনের বিশৃঙ্খল সময়ে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবক্ষয়ের সূচনা হয়। বাঙ্গালি জীবনের এই অবরুদ্ধ পর্বে যে কবি বাঙ্গালিকে ভক্তিরসে আপ্লুত করেছিলেন, তিনি হলেন 'কবি রঞ্জন' রামপ্রসাদ সেন। তাঁর রচিত গানগুলির ছত্রে ছত্রে পল্লীনির্ভর বাঙ্গালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের গভীর সুর ধরা পড়েছে। তাঁর রচিত গানগুলি 'রামপ্রসাদী সংগীত' নামে সুপরিচিত। তাঁর আগে এমন ধরনের মাতৃগীতি বাংলা সাহিত্যে ছিল দুর্লভ।

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন, যিনি কালীভক্ত ও শ্যামাসংগীতকার হিসেবে বাঙ্গালির অন্তরে এখনও বেঁচে আছেন, চব্বিশ পরগনার হালিশহরের কুমারহট্ট গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে আনুমানিক ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন রামরাম সেন। সেকালে নামের সঙ্গে 'রাম' নামের ব্যবহার ছিল সমাজে স্বাভাবিক চলিত রীতি। খুব কম বয়সেই তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হয়।

পিতার মৃত্যুর পর সংসার প্রতিপালন করার জন্য তিনি কলকাতার জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়িতে মুহুরিগিরি করতেন মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে। অবসর পেলেই শ্যামাসংগীত রচনা করে খাতায় লিখে রাখতেন। জনশ্রুতি, সাধক কবি হিসেবের খাতায় 'আমায় দে মা তবিলদারি, আমি নেমক হারাম নই শঙ্করী' এই গান লেখেন। তাতেই বিষয়টি জমিদারের নজরে আনেন এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক। জমিদারের কাছে নালিশ করেন তিনি। উদ্দেশ্য রামপ্রসাদকে নিষ্কৃত করা।

কিন্তু খাতার পাতায় অমৃতোপম সঙ্গীতের খসড়া পড়ে মুগ্ধ জমিদারের অন্তঃকরণ কেঁদে উঠলো। বুঝলেন, মায়ার জগতে রামপ্রসাদের আকুতি কীসের জন্য! সে অর্থ নয়, কাম নয়, যশ নয়; বরং জগন্মাতার চরণতলের আকাঙ্ক্ষায়, লীলাময়ীর লীলাখেলায় সঙ্গী হতে তিনি পাগল। নিত্যের মাঝে অনিত্যের সন্ধানী এক ভক্ত সন্তান। বুঝলেন, স্বার্থপর জগতে তাঁর স্থান বড্ডই বেমানান। জমিদার দুর্গাচরণ তাই কবির কবিত্ব চর্চার যথাযথ প্রকাশের সুযোগ করে দেন। আমৃত্যু তাঁর জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির বরাদ্দ করে বাড়িতে পাঠালেন কবিকে আর কাব্যচর্চার অনুরোধ করলেন।

রামপ্রসাদের কবি প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশে বারি সিঞ্চন করেছিলেন কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। যাঁর সভা অলংকার করে বসতেন পঞ্চরত্ন। তাদের অন্যতম রত্ন ছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, রসিক শ্রেষ্ঠ গোপাল ভাঁড় এবং বিশিষ্ট তান্ত্রিক তথা রামপ্রসাদের গুরু কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র এই নির্লোভ নিরহংকারী ব্যক্তিটিকে ব্রহ্মময়ীর পদতল থেকে টলাতে সক্ষম হলেন না। তিনি নিজের রচিত পঞ্চবটীর তলায় পঞ্চমুণ্ডির আসন ছাড়তে নারাজ। যিনি প্রলুব্ধ হন না, পার্থিব ধনসম্পদে তৃষিত নন, শঙ্করী ভিন্ন অন্যের অধীনতা স্বীকার করেন না, তাঁকে মায়ের চরণপদ্মের মকরন্দ থেকে বঞ্চিত করবেন কীভাবে! অতএব চেষ্টায় ক্ষান্তি দিলেন। কিন্তু রুষ্টও হলেন না। বুঝলেন—

'ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না—
ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে।'

মন যদি সে না দিল, তারই মন নিক কেড়ে। তিনি রামপ্রসাদকে কবিত্বকীর্তির পুরস্কার স্বরূপ দিলেন 'কবিরঞ্জন' উপাধি।

রামপ্রসাদ শুধু শ্যামাসংগীত রচনা করেননি, তিনি যে গায়কী রীতি প্রবর্তন করেছিলেন তা 'প্রসাদী সুর' নামে পরিচিত। তাঁর রচিত সংগীতগুলির সুর বা গীতিভঙ্গি বঙ্গে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' ও

'কালীকীর্তন' কাব্যও রচনা করেন। তাঁর আগে এমন ধরনের মাতৃগীতি বাংলা ভাষার সাহিত্যে ছিল না। সহজ সরল ভাষায় ভক্ত প্রাণের আকুতি গানগুলির মূল সম্পদ।

রামপ্রসাদের সময়ে বঙ্গে ও ভারতে ছিল মুসলমানি শাসন। কাজেই নিজ ধর্মে সমন্বয়ের তাগিদ হিন্দু সমাজেরই অনুভব করার কথা এবং সেটাই হয়েছে। রামপ্রসাদের গানে দেখা গেল, কালী-কৃষ্ণে কোনো প্রভেদ তিনি দেখছেন না। অনায়াসে বলতে পারলেন, 'শ্যামা হলি মা রাসবিহারী/নটবর বেশে বৃন্দাবনে।' হিন্দু সমাজে ভেদজ্ঞান তিনি কার্যত দূর করেছিলেন। হয়তো এই ব্যাপারে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও প্রভাবিত করেছেন। রামপ্রসাদের মহাপ্রয়াণের প্রায় ষাট বছর বাদে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তৎকালীন সময়ে রামপ্রসাদ তাঁর কবিত্বের স্ফূরণে দূর করতে চাইলেন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্যদের বহিরঙ্গের বৈষম্য।

'মন করো না দ্বেষা-দ্বেষী
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।।
আমি বেদাগম পুরাণে
করিলাম কত খোঁজ তালাসি।
ওই যে কালী, শিব, রাম
সকল আমার এলোকেশী।'

দেখা যাচ্ছে তাঁর সংগীতে শিবরূপে শিঙ্গা ধরেন, কৃষ্ণরূপে বাজান বাঁশি, রামরূপে ধরেন ধনু, কালরূপে হাতে অসি। তাঁর কাব্যে শ্মশানবাসিনী শ্যামা, অযোধ্যা নিবাসী রাম অথবা গোকুল নিবাসী কৃষ্ণ একাকার। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'-এর আগে হিন্দু ধর্মের মধ্যে একত্রীকরণের বীজ নিহিত ছিল রামপ্রসাদের কাব্যে। হিন্দুত্বের অন্তর্ধর্মীয় নানান পথ অভিন্ন বললেন তিনি এবং তার সমন্বয়ও করলেন। ভারতবর্ষের বহুধা বিভক্ত হিন্দু সমাজ সেই সময় সনাতন ধর্মের ভেতরে সমন্বয় খোঁজার দিকে বেশি মনোনিবেশ করেছিল। ভক্তি আন্দোলন ছিল তারই এক অন্যতম তাগিদ। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্গে আধ্যাত্মিক নবজাগরণ সম্পন্ন হলো।

অষ্টাদশ শতকে বঙ্গে ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয় সাধক রামপ্রসাদের নেতৃত্বে। কালী-সাধক রামপ্রসাদ ইসলাম মতে সাধনা করেননি কোনোদিন।

বঙ্গদেশে একটা সময় ছিল, যখন সমাজজীবন ছিল রামায়ণ ও রামনামে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালি তাদের সন্তানের নামে 'রাম' কথাটি যোগ না করে পারতেন না। সন্তানকে ডাক দিয়ে পরমারাধ্যকেই তাঁরা ডাকতেন। 'রামপ্রসাদ' এমনই এক নাম। যদি রামপ্রসাদের বংশলতিকা দেখি, তবে দেখবো সেখানেও 'রাম' নামের ছড়াছড়ি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি যে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন, সেখানে আত্মপরিচয় অংশে পূর্বপুরুষের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে—

'সেই বংশসম্ভূত ধীর সর্ব-গুণযুত,
ছিল কত শত মহাশয়
অনাচার দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল হৃদয়।।
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।।
প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া।।'

দেখা যায় রামেশ্বর সেনের পুত্র রামরাম সেন; তার পুত্র রামপ্রসাদ সেন; রামপ্রসাদের দুই পুত্রের নাম রামদুলাল ও রামমোহন। একইভাবে আমরা দেখতে পাই গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণের বংশলতিকায় 'রাম'-যুক্ত বহু সন্তানের নাম রয়েছে। নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের বংশলতিকাতেও তাই। বঙ্গে শ্রীরাম-উপাসনার ধারা যে কতটা গভীর ও বাস্তব, এ তারই প্রমাণ।

বাস্তব জীবনের কর্মযোগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার এক অপূর্ব মিলনচিত্র রামপ্রসাদের সংগীতের পদে পদে অঙ্কিত। সংসারের অভাব-অনটনের বাস্তবতার মধ্যে অন্তরে বৈরাগ্য নিয়েও রামপ্রসাদ গৃহত্যাগী হননি। তাই সংসারের বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টকে গৌরব মনে করে মায়ের উদ্দেশ্যে তিনি গান বেঁধেছেন : 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই।'

শ্যামাসংগীতের মতো আগমনি গানের ধারাটিকেও প্রবহমান রেখেছিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন। পূজার সময় পূজা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেবী দুর্গার পুত্র-কন্যা-সহ কৈলাস থেকে মর্ত্যে আগমনের কাহিনিকে কেন্দ্র করে এই গানগুলি রচিত। দুর্গা গৃহস্থ ঘরের কন্যার মতো স্বামীর ঘর থেকে পিতার ঘরে আগমন করেন। এ ব্যাপারে মা মেনকার যে উদ্বেগ তাও গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও রামপ্রসাদ কৃষ্ণকীর্তন, শিবকীর্তন, কাব্যও রচনা করেছেন।

রামপ্রসাদের প্রয়াণঘটনা অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন, যা একটি লোককথার জন্ম দিয়েছে। শোনা যায়, কালীপূজা শেষে মূর্তি বিসর্জনের সময় 'তিলেক দাঁড়াওরে শমন' গানটি গাইতে গাইতে তিনি মূর্তির সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। এটি ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।

সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে রামপ্রসাদ সেনের চিহ্ন বহন করে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল তারিখের একটি কবুলটিপত্র। এই পত্রটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে রামপ্রসাদ সেন জীবিত ছিলেন। উল্লিখিত কবুলটিপত্রটি বড়িশার সাবর্ণ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত আছে।

তথ্যসুত্র :

১. প্রবন্ধ-'রামপ্রসাদের কালী সাধনা'— কল্যাণ গৌতম ও সৌকালিন মাঝি। ('ঋতম' বাংলায় প্রকাশিত, ২৪ অক্টোবর, ২০২২)

চিত্তরঞ্জন পার্কের শ্যামাপূজা

অত্রি মল্লিক

বছরের যে সময়টায় ভারতবর্ষ ও তথা বিশ্বের নানা জায়গায় মূলত প্রবাসী ভারতীয় জনসমাজে সাড়ম্বরে দীপাবলি উৎসব পালিত হয় ঠিক সেই সময়েই কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালির পাড়ায় পাড়ায় তথা অঞ্চল বিশেষে, মন্দিরে, বৃহত্তর পারিবারিক পরিসরে উদ্‌যাপিত হয় শ্যামাপূজা বা কালীপূজা। দীপাবলি উৎসবে লক্ষ্মীপূজাও হয়ে থাকে। লক্ষ্মী হলেন ধনের দেবী। নিজ নিজ গৃহে মায়ের আরাধনা করা হয় যাতে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রাপ্তি হয় এবং সুখ-সমৃদ্ধি ও ধনসম্পদ জাতীয় সকল প্রকার বিষয়ের শুভ আবির্ভাব ঘটে অন্য সব বাধা বিপত্তির অবসানের মাধ্যমে। কিন্তু এই সময়েই এই আলোর উৎসবে বাঙ্গালি উদ্‌যাপন করে কালীপূজার। মাতৃশক্তির অন্যতম রূপ হলেন কালী। তিনি দুষ্টের দমন ও বিনাশের মাধ্যমে ভূলোকে দৈবীশক্তির দ্বারা মনুষ্যকুলকে রক্ষা করেন এমনটাই মনে করা হয়। শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের আলোকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, মা কালী হলেন নারীশক্তির এক সাংকেতিক প্রকাশ। তিনি সব রকম আসুরিক শক্তিকে পরাজিত করে এই ধরাধামে অশুভের অবসান ঘটিয়ে আলোর দিশা প্রদান করেন। সেই বোধেই হয়তো বাঙ্গালি সমাজের একটা বড়ো অংশ এই হেমন্তকালে কালীপূজা করে থাকেন।

বঙ্গপ্রদেশের ভৌগোলিক গণ্ডি পেরিয়ে বহু জায়গায় যে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে নতুন দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক অন্যতম। এই চিত্তরঞ্জন পার্কে বসবাসকারী বাঙ্গালির সংখ্যা নেহাত কম নয়। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হওয়া, মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর ও আরও অবশ্যম্ভাবী কিছু সামাজিক অবস্থার কারণে অনেক বাঙ্গালি দলে দলে আশ্রয় নিয়েছিলেন নতুন ও পুরনো দিল্লিতে। কর্মসূত্রে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়েছেন এমন বাঙ্গালির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। জনঘনত্ব বৃদ্ধির দরুন দিল্লিতে বাঙ্গালির সংখ্যাও এখন বেশ অনেকটা বেড়েছে। দিল্লির বাঙ্গালি পরিমণ্ডলে ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম হলো চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটি।

এই স্থানে পরপর একই সারিতে তিনটি মন্দির। মাঝেরটি সবচেয়ে বড়ো, যেটিতে মা কালীর বিগ্রহ বিরাজমান এবং অন্য দুটির একটিতে শিবলিঙ্গ ও অন্যটিতে রাধা-কৃষ্ণ মূর্তি রয়েছে। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দিরের এই তিনটি মন্দিরের চূড়ার স্থাপত্যই অপূর্ব। কালীপূজার রাত্রে আলোকসজ্জায় সজ্জিত এই মন্দির প্রাঙ্গণে যখন অজস্র মানুষের ঢল পরিলক্ষিত হয়, তখন অপরূপ সুন্দর একটি উৎসবের রূপ সর্বত্র পরিস্ফুটিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি চিত্তরঞ্জন পার্কের আনুমানিক ২০ জন আবাসিক এই মন্দির নির্মাণ কার্যে মনস্থির করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই ৮ জনের একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় পরবর্তী কার্যকলাপের কথা মাথায় রেখে। ওই বছরের ৪ মার্চ চিত্তরঞ্জন পার্কের মেলা

গ্রাউন্ড নামাঙ্কিত স্থানে ওই অঞ্চলের জমির মালিকানা রয়েছে এমন প্রায় ২৫ জনকে নিয়ে চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দির সোসাইটির স্থাপনা হয়। ১৯৭৩ সালেরই শেষের দিকে সোসাইটি দিল্লি প্রশাসনের অন্তর্গত সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে পঞ্জীকৃত হয়। ধীরে ধীরে রাস্তা থেকে মন্দিরে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় সিঁড়ি নির্মাণ, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সমিতির কার্যভার গ্রহণ এবং অসমতল ভূমিকে পূজার উপযুক্ত সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত এসব কিছুই হয়েছে অধুনা এই চিত্তরঞ্জন পার্কের বিখ্যাত শিবমন্দিরে। ১৯৭৭ সালের ১০ নভেম্বর এই চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দির সোসাইটির তৃতীয় কার্যনির্বাহী সমিতি চিত্তরঞ্জন পার্ক পূজা সমিতির থেকে কালীপূজার ভার গ্রহণ করে। তৎপরবর্তীতে কালীপূজার প্রাক্কালে কলকাতা থেকে নির্মিত কালীমূর্তি আসত চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দিরে। মন্দির নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ জোগাড় না হওয়ার কারণে তালকাটোরা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চারটি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালের ২৮ মে রামকৃষ্ণ মিশন দিল্লি শাখার তৎকালীন প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী বুধানন্দজী মহারাজের দ্বারা কালী মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা হয়েছিল। প্রয়োজন অনুসারে সময়ে সময়ে পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়েছে অনেক কিছুরই। দৈনিক পূজা, সান্ধ্য আরাত্রিক ও ভোগ বিতরণ হলেও বর্তমানে চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দিরে প্রত্যেক বছরের মতো দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজার বিশেষ আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যে থেকেই দিল্লির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকসমাগম হতে থাকে মন্দির চত্বরে। ধূপ, ধুনো, মোমবাতি, প্রদীপের আলোয় ও সুগন্ধে যেন পূজার আচারে উৎসবময়তার আঁচ ফুটে থাকে সর্বক্ষণ। রাত বাড়তেই চিত্তরঞ্জন পার্ক নিবাসী মানুষের সমাগম দেখতে পাওয়া যায় পূজার উপকরণ সামগ্রীর প্রস্তুত থেকে শুরু করে ভোগ রন্ধন সবেতেই সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অঞ্চলের অনেক আবাসিক আসেন স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে।

পূজা শেষ হতেই শুরু হয় ভোগ বিতরণ। সে এক প্রকার মধ্যরাত। রাত একটার সময় ভক্তসমাগমে মন্দির প্রাঙ্গণ যেন গমগম করে। বর্তমান পরিচালন সমিতির সাধারণ সম্পাদক হলেন ড. রাজীব নাগ। সমিতি মন্দিরের উন্নতিকল্পে ঠিক কী কী ভাবছে, আঞ্চলিক মানুষ তথা সকল দর্শনার্থীর সুবিধার স্বার্থে এই নবগঠিত সমিতি ঠিক কতটা আন্তরিকভাবে বদ্ধপরিকর, তা সবিস্তারে প্রদীপবাবুর থেকে জেনে পেরে, অবাক হতে হয় তাঁদের কর্মনিষ্ঠার গভীরতা দেখে। অবাক হতে হয় কী সুচারু পদ্ধতিতে সৃষ্টিশীল ও চিত্তরঞ্জন পার্কের বিদগ্ধ মানুষজন সতত ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে এই মন্দিরের জন্য চিন্তা করেন, এগিয়ে আসেন এবং ফলপ্রসূ কর্মকাণ্ডের জন্য লাগাতার পরিশ্রম করেন।

পূজাপ্রাঙ্গণ তথা সম্মুখের রাস্তায় আলপনা দেওয়া থেকে প্রতিমা আনয়ন, মূর্তিসজ্জা সবকিছুতেই এই নবীনদের উৎসাহ নজর কাড়ার মতো। এই পূজায় খুব নিষ্ঠা সহকারে ওই ব্লকের বসবাসকারী মায়েরা পূজার জোগাড় ও নৈবেদ্য প্রস্তুতিতে একে অপরকে সহযোগিতা করেন। আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের জন্য ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। কার্যকারিণী সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থেকে ডি ব্লকের জনসাধারণ এই কাজে নিজ ইচ্ছায় এগিয়ে আসেন।

আরও দুটি পূজার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। একটি হলো পার্শ্ববর্তী ই ও এফ ব্লকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত শ্যামাপূজা এবং অন্যটি সি ব্লকের আবাসিকদের ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত কালীপূজা। সাধারণ ভাবে দুর্গাপূজা যেমন অন্তত চার-পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান, কালীপূজা কেবল এক দিনেরই উদ্‌যাপন। কিন্তু ই ও এফ ব্লকের পূজা কেবলমাত্র কালীপূজার দিনেই নয়, আগে ও পরে আরও একদিন করে সর্বমোট তিন দিনের জন্য পালিত হয়।

পূজার উদ্বোধনের দিনেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও থাকে আকর্ষণীয় আনন্দমেলার আয়োজন। চিত্তরঞ্জন পার্ক তথা দিল্লি শহরের নানা জায়গা থেকে উৎসুক মানুষজন খাদ্যসামগ্রী নিজে হাতে তৈরি করে নিয়ে আসেন এবং সেগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করেন। হরেক রকমের খাদ্যসম্ভারে মণ্ডপ প্রাঙ্গণ ভরে থাকে, মানুষের মধ্যে এই অভিনব আয়োজনকে ঘিরে উদ্দীপনাও চূড়ান্ত। নাটক ও কবিতা প্রতিযোগিতার পাশাপাশি দৈনিক সান্ধ্যকালীন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্তরঞ্জন পার্কের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে এই পূজাটির সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা অনেকেরই নজর কাড়ে। চিত্তরঞ্জন পার্ক সংলগ্ন অঞ্চলের অনেক বাসিন্দা এই পূজায় এসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

চিত্তরঞ্জন পার্কের আরও উল্লেখযোগ্য তিনটি পূজা হলো বি ব্লক, পকেট ৪০ বা নবপল্লী এবং কে ব্লকের কালীপূজা। এর মধ্যে বি ব্লকের পূজাটি অনুষ্ঠিত হয় বি ব্লকে অবস্থিত মা সারদা পার্কের মুক্তাঙ্গনে। অন্যদিকে কে ব্লক এবং নবপল্লীর পূজা দুটিও ওই অঞ্চল সংলগ্ন মুক্তপ্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই দুটি পূজাতেই ভোগ হিসেবে অর্পণ করা পোলাও মটন বিতরণ করা হয় আগত সকল ভক্ত তথা দর্শনার্থীদের জন্য। কে ব্লকের কালীপূজা যেটি কোঅপারেটিভের পূজা নামেও সর্বজনখ্যাত, সেখানে কালীপূজার রাতে কম-বেশি ৩৫০ কেজি মাটন রান্না করে মাকে ভোগ দেওয়া হয় এবং তারপর সেটি ভোগ হিসেবে বিলিয়ে দেওয়া হয়। এই চিত্তরঞ্জন পার্কের সংলগ্ন কালকাজী ডিডিএ ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের দ্বারা আয়োজিত পার্ক মার্কেট নম্বর ২ সংলগ্ন আরও একটি পূজা হলো মেলা গ্রাউন্ডের কালীপূজা। নতুন পোশাক, চিরাচরিত উপাচার, নতুন ব্যবস্থাপনা, কিছু পুরানো ও সঙ্গে কিছু নতুন মুখ, সাবেকিয়ানা আবার কোথাও আধুনিকতার স্পষ্ট ছাপ। কোথাও একেবারে নিরামিষ খিচুড়ি ভোগ তো কোথাও ভাত-মাংস ভোগ হিসেবে বিতরণ, সব মিলিয়ে এ যেন এক আনন্দযজ্ঞ। □

বঙ্গদেশে কালীমাতার প্রভাব

সাধ্বী সুমিত্রাম্বা (মিতা মা)

বড়ো বড়ো টানাটানা দুটো চোখের দুই কোল ছাপিয়ে টস্‌টস্‌ করে ঝড়ে পড়ছে জল। ভাবে গদগদ। বাহ্য জগতের কোনো হুঁশ-ই নেই। মন-প্রাণ আকুল করা গান ধরেছেন রামপ্রসাদ—

'অপার সংসার, নাহি পারাপার,
ভরসা শ্রীপদ—সঙ্গের সম্পদ
বিপদে তারিণী করগো নিস্তার'

অন্তরভেদী সে গান। কি বৈরাগী অথবা সংসারী— পাগল করা সেই গান শুনে সাধ্য নেই স্থির থাকার।

সারা বঙ্গদেশের মানুষ শুনেছে রামপ্রসাদের গান— আজও শুনছে। দুঃখ-দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত, বঞ্চনা-বেদনা আর না পাওয়ার গ্লানিতে হতাশাগ্রস্ত সংসারী মানুষগুলোর চেহারাটি দেখেছিলেন রামপ্রসাদ। তাইতো লিখতে পেরেছিলেন অমন গান— সহায় সম্বলহীন দীন দরিদ্রের মর্মভেদী আকুতির পরিভাষায়। আর গাইতেনও এমন দরদ দিয়ে যে জগজ্জননী ঈশ্বরীর অন্তরেও যেন বুঝি ঝড় বয়ে যেত। ওই জন্যেই তো অর্চাবতী কালী তার কাছে একদিন হয়ে উঠেছিলেন চেতন প্রতিমা। রামপ্রসাদের ওইরকম তোলপাড় করা শরণাগতি— মা আর স্থির থাকতে পারেননি, কথা কইতে বাধ্য হয়েছিলেন রামপ্রসাদের সঙ্গে। নিজের কন্যার রূপধার বাগানের বেড়া পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছেন জগজ্জননী কালী। রামপ্রসাদের এই অতি উচ্চ সাধন সত্তার সঙ্গে পরিচিত মহাজনেরা এই মহাসাধককে অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। শাস্ত্র বলেছে— সাধয়তি সর্বেষাম্— যাঁরা এই জগৎসংসারের সর্বস্তরের মানুষকে সমাদর করেন— মন প্রাণ দিয়ে তাদের গ্রহণ করেন তারাই তো সাধক।

বঙ্গভূমিতে যাঁকে নিয়ে মহাসাধনার এক ধারা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে সেই দেবী কালিকার মাহাত্ম্য ও সাধনতত্ত্ব, অর্থাৎ কালীতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই এসে পড়ে কালতত্ত্ব। মহাকালের কথা। বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরের কাছে জানতে চেয়েছিলেন— বার্তা কী? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন— মোহরূপী পাত্রে সকল প্রাণীকে গ্রাস করে রন্ধন করছেন মহাকাল, মহাকালের এই রন্ধন যজ্ঞের অগ্নি হলেন সূর্য, দিবারাত্র হলো ইন্ধন আর ঋতু মাসাদি হাতারূপ পরিপাক দণ্ড। এটাই বার্তা। অর্থাৎ জীব মরণশীল, জন্মগ্রহণ করা মাত্রই এক একটি দিন,

ফঃ ৩

সপ্তাহ, মাস, বর্ষ অতিক্রম করে জীব এগিয়ে চলেছে সেই অনিবার্য পরিণামের দিকে। সর্ব জীবের কলন বা গ্রাসকারী হলেন কাল— মহাকাল। আবার সেই মহাকালকে যিনি নির্বিশেষে গ্রাস করে চলেছেন, তিনিই কালী, আদ্যাশক্তি। মহানির্বাণ তন্ত্রের ভাষায়— কালের কলনকারী বা কালজয়িনী এই মহাশক্তির উপলব্ধি যিনি করেছেন তিনি হলেন কালীর পূজক। মৃত্যুঞ্জয়ী কালজয়িনী মহাশক্তির পূজা হলো কালীপূজা।

নামের দুটি রূপ— দিব্যতা ও করালতা। দিব্যতায় হয়েছে অমৃত্যু, রয়েছে অভয়, রয়েছে সৃষ্টির সুর ঝংকার রয়েছে মাধুর্য। করালতায় আছে মৃত্যু, আছে ভয়, আছে সংহার অথবা ভীষণতাময় এক চরম নির্মমতা। বিপরীত মুখীনতার সমন্বয়ে সৃষ্টির শাশ্বত বীজ কাল থেকে কালান্তরে বয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি। তিনিই আবার নির্বিশেষ শূন্য থেকে মহাশূন্যতায় নিশ্ছিদ্র তমসার ঘোর ঘনঘটার মাঝে নিরন্তর বাজিয়ে চলেছেন লয়ের শেষ সুর। একই মূর্তিতে পূর্ণ বিপরীত মুখীনতার ধারায় এমন করে শাশ্বত সত্যের সুর যাঁর মধ্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তিনি অন্য কেউ নন— তিনি কালী। হয়তো এই জন্যেই মাতৃময় সাধক গেয়েছেন—

'আছো সর্বঘটে অক্ষপুটে
সাকার আকার নিরাকারা।।'

বঙ্গের সাধনায় কালী নিছক কোনো দেবী নন; প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা। এক সাধুর মুখে 'কালী প্রধানা হ্যায়' শুনে প্রতিবাদ করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ; বলেছিলেন তিনি প্রকৃতি সদানন্দময়ী। তাই বাঙ্গালি তান্ত্রিকদের কণ্ঠে পরিণত হয়— মা-ব্রহ্মময়ী। কালীই ব্রহ্ম এই জেনে সাধক দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে চলে যান। তাঁর হৃদয়কমল মঞ্চে তিনি শ্যামা, দোল খান তিনি তাঁর আত্ম চৈতন্যে। সাড়ে তিন হাত দেহের ছাঁচে তিনিই কুণ্ডলিনী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন সার্ধত্রিবলায়া কুলকুণ্ডলিনী রূপে।

শাস্ত্রে অষ্টপাশের কথা বলা হয়েছে। পাশবদ্ধ হয়ে শিব জীব হন। শাস্ত্রানুসারে পশ্বাচারের সাধনায় ভক্তির আকুতিই প্রধান। নিজেকে ও শক্তিকে জানার সাধনা হলো বীরের (বীরাচারী) সাধনা। শুধু জানা নয়, নিজেকে জেনে আত্মশক্তি রূপে শক্তিকেই লাভ করা। আর দিব্যাচার বা দিব্যভাবের সাধনার ফলশ্রুতি প্রেম। তন্ত্র সাধনার সপ্তআচার এই তিন ভাবেই বিন্যস্ত। বঙ্গের সাধককুলের অভিমত দেবী কালিকা ভক্তিতেই প্রসন্ন। সেই ভক্তির পথ ধরেই যুগ যুগ ধরে তিনি বঙ্গের মানুষের অন্তরে ধরা দিয়েছেন। নিতান্ত সংসারী যে সেও তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয় না। আইনে যাই থাকুক না কেন, আইনের চেয়ে নজির বড়ো। তাই তন্ত্রে সাধনার যে ধারাই থাকুক না কেন, নির্দ্বিধায় সাধক বলতে পারেন—

থাক্ পুরোহিতের মন্ত্র পুরোহিতের মুখে, মন্ত্র কইলে তন্ত্র ভুলে যাই/আমার মা মহামন্ত্র তার মন্ত্র কি স্বতন্ত্র বাপার তন্ত্রে হেন লেখা নেই।

বাঙ্গালির এই আকুতিও তাঁর দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে। দেবী হয়েও তিনি কান পেতে শোনেন তাপিত তৃষিত আর্ত দরিদ্র জীবের প্রাণ আকুল-করা ডাক। শাস্ত্রে বলেছে তিনি 'দ্যোতনশীলা'। শব্দটি দিব্ ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ 'ক্রীড়া'। মা খেলতে ভালোবাসেন— এই জগৎ নিয়েই তাঁর খেলা। ভাবের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন— 'নেতা কাঁথার হাঁড়ি'— কী নেই তাতে? সৃষ্টির বীজটা পর্যন্ত সযত্নে রক্ষিত। ভাঙা-গড়ার খেলায় তা যে অপরিহার্য। সাধক কবি তাই রসিকতা করে পেয়েছেন—

'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন
মুণ্ডমালা কোথা পেলি।'

বঙ্গের বুকে এমন মাতৃময়ী রূপের প্রতিষ্ঠা যিনি দিয়েছিলেন ধন্য সেই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, ধন্য তাঁর সাধ্য আর সাধনা। সেই তবে থেকেই বঙ্গের নর-নারীর প্রাণে সাড়া জাগিয়ে চিরস্থায়ী আসন পেতেছেন অর্চাবতী কালী।

বঙ্গের বুকে এসেছেন ব্রহ্মানন্দ, এসেছেন আত্মানন্দ— পীঠাধীশ্বরী কালিকার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে কলকাতার বুকে। সেদিক থেকেই প্রত্যক্ষে কালীক্ষেত্র বঙ্গপ্রদেশ। এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির প্রতিষ্ঠিতা ভবতারিণীর জাগরণ ঘটিয়ে জীবকে স্মরণ করিয়েছেন চতুর্বর্গ প্রদায়িনী মহাকালীর মহিমা। মায়ের কৃপা বর্ষিত হয় যার পরে— অজ্ঞান নাশ হয়ে পরম জ্ঞানের উদয় হয় তার অন্তরে।

অভিমান আর অকর্তা বোধে কৃতকর্ম হয়ে ওঠে পূজা। দর্প, অহংকার, ভয়, শোক, মান, ঘৃণা ইত্যাদি পাশসমূহের কর্তনে জীব হয়ে ওঠে শিব। করুণাময়ীর অপার কৃপাতেই অবশেষে কাল থেকে কালান্তরের যাত্রায় মাতৃসঙ্গে মিলিত হয় জীব, শিব স্বরূপে। □

With Best Compliments from :-

TARA MAA PAPER CUTTING CO.

9/8A, Nalin Sarkar Street
Kolkata - 700 004

কালী সাধক কবি কমলাকান্ত

সরোজ চক্রবর্তী

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট শাক্ত সাহিত্য উদ্ভবের প্রত্যক্ষ কারণ। তুর্কি আক্রমণের পর সমাজ যেভাবে মঙ্গলকাব্যের ধারায় নতুনভাবে দিশা পেয়েছিল আদ্যাশক্তি- মাতৃশক্তির মাহাত্ম্যে— যেভাবে চণ্ডী, দুর্গা, অভয়া, অন্নদা, কালিকার শক্তি ধারায় জাতি বাঁচার রসদ পেয়েছিল সেভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তি জুগিয়েছে শাক্ত সাহিত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংকটকালে ওই শাক্তধারা আবার নতুন খাতে প্রবাহিত হয়ে নতুন ভাব প্রেরণার নব আঙ্গিকে, নতুন সুর ও গীতিময়তায় বাণীবদ্ধ হয়ে বঙ্গের সাহিত্যের নবতম অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। শক্তি সাধনার সুউচ্চ আদর্শসংবলিত গীতিগুচ্ছই হলো শাক্ত পদাবলী।

শাক্তপদাবলী বঙ্গদেশ, বাঙ্গালি-জাতি ও বাংলা সাহিত্যের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। শাক্ত চিন্তাধারা এদেশে খুবই সুপ্রাচীন, বাঙ্গালির জাতীয় জীবনে নানা সময়ে নানাভাবে তা প্রতিফলিত হয়েছে। শাক্ত সংগীতে বাঙ্গালি প্রাণের সার্বিক অভিব্যক্তি ঘটেছে। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় প্রভূত পরিমাণে বৈষ্ণবপদ রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার সঙ্গে বাঙ্গালির বাস্তবজীবনের কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু শক্তি সাধনায় যখন জগজ্জননীকে আপন গৃহে মাতৃরূপে স্থাপন করা হলো, তখন একদিকে যেমন বাঙ্গালির ভক্তি সাধনায় এক বিশেষ দিক লক্ষ্য করা গেল, তেমনি অবারিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করল কবিত্বের ধারা। অর্থাৎ একদিক দিয়ে জগজ্জননীর দিব্যরূপ প্রকাশে যেমন বাঙ্গালির অধ্যাত্মপিপাসার নিবৃত্তি ঘটে, তেমনি এর রসরূপ উদ্‌ঘাটনে কাব্যরস পিপাসাও পরিতৃপ্ত শাক্ত পদাবলীর দুটি প্রধান পর্যায়— একটি উমা সংগীত বা আগমনী বিজয়ার গান, অপরটি শ্যামাসংগীত তথা সাধনসংগীত। আগমনী বিজয়ার পদে উপাস্য দেবী কন্যারূপিণী উমা।

ভক্তকবি কমলাকান্ত আপন মনের মাধুরীতে মাতা-কন্যার মানবিক সম্পর্ককে আন্তরিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লীলা পর্যায়ের পদের অন্তর্গত আগমনী-বিজয়া পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার কমলাকান্ত। মায়ের কাছে কন্যার বয়স বাড়ে না— মেনকার স্বপ্নে উমা তাই— 'বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে; আধ আধ মা বলে বচনে সুধাসার।' এরপর মেনকার অনুরোধে গিরিরাজের কাছে গৌরী আনতে যাওয়া— 'কবে যাবে বল গিরিরাজ! গৌরীরে আনিতে। ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।। —কারণ উমার সংসারে সতীন আছে, আর উমার স্বামী তো শ্মশানবাসী। সুতরাং 'কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে'। কোনো বাঙ্গালি মা তো বিবাহিত মেয়ের অনিবার্য দুর্ভাগ্যকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কমলাকান্তের এই পদে তৎকালীন সমাজের নির্মম প্রথার প্রতি যেমন ইঙ্গিত আছে, তেমনি আছে চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের আকুলতা। পিতৃগৃহে আসার পর কন্যার অভ্যর্থনায় যে অন্তরঙ্গ সুরটি বেজে উঠেছে তা কমলাকান্তের একান্ত নিজস্ব।

অন্যদিকে উমার পিতৃগৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে মায়ের জন্যে কন্যা উমার ব্যাকুলতা। কমলাকান্তের রচিত আগমনী পদে মাতা-কন্যার সুমধুর সম্পর্কের বিভিন্ন মাত্রা রচিত হয়েছে। কবি কখনো লেখেন, 'গিরি! প্রাণগৌরী আন আমার। উমা বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার।। আবার কখনো মেনকাকে দিয়ে বলিয়েছেন— 'যাও গিরিবর হে, আনো যেয়ে নন্দিনি ভনে আমার গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রয়েছ ঘরে, কি কঠিন হৃদয় তোমার, হে, মেনকা গিরিরাজকে অনুরোধ করেছেন যে, উমা কেমন আছে তা জানা দরকার। গিরিরাজের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন। উমার বিধুমুখ না দেখে মেনকার ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত আগমনী পর্যায়ের পদে মাতৃহৃদয়ের অভিব্যক্তি ও ব্যাকুলতা আন্তরিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

কমলাকান্তের শাক্তপদে 'মধুর রসের অস্তিত্ব নেই— সবটাই বাৎসল্য রস। লীলাময়ীকে কন্যারূপে উপাসনা পৃথিবীর ভক্তি সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। আগমনী বিজয়া গানের সূচনা মেনকারানির স্বপ্নদর্শনের বিবরণের মাধ্যমে, বৈষ্ণব কবিতায় মিলনের পদ বিরহের পদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হলেও, শাক্তকবির বিজয়া গানের তুলনায় আগমনী গানের ভাব বৈচিত্র্য, নাট্য সৌন্দর্য অপেক্ষাকৃত অধিক। বিজয়ার পদে যেখানে প্রচলিত মাধুর্যপূর্ণ লৌকিক ভাব, আগমনীর পদে সেখানে মাধুর্যরসের সঙ্গে আছে ঐশ্বর্যরস। বাৎসল্যের সঙ্গে আছে ভক্তিরস। আবার কোথাও বা উভয়রসের সংমিশ্রণে শাক্ত পদাবলী বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশিত। আগমনী গানে লৌকিকভাব মানবীয়তার নিবিড় রসসঞ্চারণে বাঙ্গালি হৃদয়ে অপূর্ব অলৌকিক আবেদন জাগায়। মাতা-কন্যার মিলন সুখ। অভিমানের রুদ্ধ দুঃখ, মেয়ের অভিযোগ, লজ্জা, দুঃখ, মা-মেয়ের আত্মহারা ভাব সব মিলিয়ে বাৎসল্য প্রতি

বাৎসল্যের অলকানন্দা- মন্দাকিনী ধারার মিলিত প্রবাহে পরিণত হয়েছে। কন্যা উমার জন্যে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রায় প্রতিটি আগমনী গানের বিষয়বস্তু।

বিজয়ার গানের মধ্যে দিয়ে বঙ্গের মাতৃহৃদয়ের সকরুণ ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। উমার বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার যে বেদনাদায়ক দৃশ্য তা বিজয়ার পদে ফুটে উঠেছে। কবি কমলাকান্ত নিপুণভাবে মা মেনকার হৃদয় যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন। নবমী নিশিকে যেতে নিষেধ করছেন। বলছেন— 'ওরে নবমী-নিশি, হৈওরে অবসান।' নবমী শেষ হলে দশমীর প্রভাতেই প্রাণ স্বরূপা কন্যা উমা চলে যাবে। তাই নবমী রাত্রি তাঁর কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কপট বলে মনে হয়েছে। কবি মা মেনকার কণ্ঠে বলেন— 'কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত; আমি ভাবিয়ে ভবের রীত হয়েছি পাষাণি গো।। পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠানো যায়; আবার কখনো বলেন, 'এই খানে দাঁড়াও উমা! বারেক দাঁড়াও মা। তাদের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও, গো।।'

সাধক কবি রামপ্রসাদ যে শাক্তপদাবলীর স্রোত বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত করেছিলেন, কমলাকান্ত তারই পরিপুষ্টি সাধন করেছেন। কিন্তু কমলাকান্তের রচনায় রামপ্রসাদের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁর শব্দচয়ন, কৌশল ও বাণীভঙ্গিমা তাঁর নিজস্ব। কমলাকান্ত শুধু সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর রচিত 'সাধকরঞ্জনে' শক্তি সাধনার গূঢ় তত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। কমলাকান্তের শাক্ত পদাবলীতেও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনকী তাঁর রচনায় কোথাও কোথাও ব্রজবুলির প্রয়োগও চোখে পড়ে। তাঁর সাধন-সংগীতে যেমন ভাবের গভীরতা আছে, তেমন শব্দচয়ন ও অলংকার প্রয়োগেও নিপুণতা আছে।

রামপ্রসাদের মতো কমলাকান্তও ছিলেন সমন্বয় সাধক। কমলাকান্তের দৃষ্টিতেও শ্যাম ও শ্যামার মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। কমলাকান্ত গেয়েছেন— ''জান না রে মন! পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়। 'মেঘের বরণ' করিয়ে ধারণ/কখন কখন পুরুষ হয়।। হয়ে এলোকেশী, করে লোয়ে অসি, দনুজ তনয়ে, করে সভয়। কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।।" —কমলাকান্ত সাধনার সেই উচ্চতম স্তরে পৌঁছেছিলেন, যেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে সাধকের আর বহিঃপূজা, যাগযজ্ঞ প্রভৃতির কোনো প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থায় সাধক বলতে পারেন— 'তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়ো নারে।। তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।।' —কমলাকান্ত সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করেছিলেন। তাই তাঁর পূজা ছিল মানস পূজা। এই অবস্থায় ভক্ত তাঁর উপাস্য দেবতাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন; আর সেখানে নীরবে-নিভৃতে চলে ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের লীলা। ভক্তের কাছে তখন বিষয়সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখ তুচ্ছ হয়ে যায়। কমলাকান্ত গেয়েছেন— 'আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।। তুমি দ্যাখ আমি দেখি।। আর যেন ভাই, কেউ না দেখে।/' —বৈষ্ণব সাধকের মতো শক্তি সাধক কখনো 'জ্ঞানশূন্য' ভক্তির প্রার্থনা করেননি, তাঁরা ভক্তিকে আশ্রয় করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। কমলাকান্তের গানগুলি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কমলাকান্ত গেয়েছিলেন— 'মজিল মন ভ্রমরা, কালীপদ- নীলকমলে। যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে।। চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালো কালোয় মিশে গ্যালো; সুখ-দুখ সমান হলো, আনন্দসাগর উথলে।। কবি এই দ্বৈতভাব আশ্রয় করে ভক্তিরস আস্বাদন করার অভিলাষী হয়েছেন।

কমলাকান্তের আদি বাড়ি বর্ধমান জেলার কালনার অন্তর্গত অম্বিকা গ্রাম। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য ও মাতার নাম মহামায়া। তাঁরা দুই ভাই ছিলেন। অম্বিকা-কালনার বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় এখনো কমলাকান্তের বাস্তুভিটের চিহ্ন আছে। বাল্যবয়সে কবি স্থানীয় টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হলে তিনি মাতার সঙ্গে মামারবাড়িতে এসে বসবাস করেন। তাঁর মামার বাড়ি হলো বর্ধমান জেলার খানা জংশন স্টেশনের কাছে চান্না গ্রামে। এখানে বিশালাক্ষী বা বাসুলি দেবীর মন্দির ও মূর্তি আছে। এই মন্দিরেই কবি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে প্রবাদ রয়েছে।

কবির সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। কালনায় বাস করার সময় থেকেই রাজবংশের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বর্ধমানের নিকটবর্তী কোটাল হাটে কবির জন্য একটি বাড়ি ও আশ্রম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসনও রয়েছে। শোনা যায়, কবিকে তিনি বর্ধমান রাজকোষ থেকে মাসে দুইশত টাকা বৃত্তি দিতেন। পরবর্তীকালে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র থেকে বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি রাজা ও রাজকুমারেরা এই মহাসাধকের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। মহারাজা তেজচন্দ্র কমলাকান্তকে সভাকবি ও পণ্ডিতের গৌরবজনক পদ দিয়েছিলেন বর্ধমান রাজসভায়। এবং পুত্র প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষার ভারও দিয়েছিলেন। কমলাকান্ত ও প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে সুগভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে কবির মৃত্যু হয়।

মহারাজা বিজয়চন্দ্র মহাতাব 'কমলাকান্ত' শীর্ষক একটি নাটক লিখেছিলেন। ১৮৫৭ সালে মহাতাব চাঁদ 'শ্যামাসঙ্গীত' নামে সাধক কবি কমলাকান্তের যাবতীয় পদ নিয়ে একটি কাব্য প্রকাশ করেন। কবি তাঁর তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে 'সাধকরঞ্জন' শীর্ষক নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তবে এটি 'সাধকরঞ্জন' না কি 'সাধক পঞ্চক' এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যাইহোক, পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে 'সাধক-রঞ্জন' নামে প্রকাশিত হয়। 'সাধকরঞ্জনে' শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, চক্রনিরূপণ, হঠযোগ, প্রদীপিকা প্রভৃতি তন্ত্র, যোগ ও হঠযোগ অনুযায়ী শাক্তসাধনার সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া সরল বাংলা ভাষায় ত্রিপদী ছন্দে বর্ণিত রয়েছে। কমলাকান্ত ভক্ত ও সচেতন কবি। ভক্তিভাব, কবিত্ব ও শিল্পোৎকর্ষের ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে তাঁর সঙ্গীতে। সাধক কবি কমলাকান্ত পারিবারিক জীবনের শান্ত পটভূমিতে আত্মোপলব্ধিকে মূলধন করে জ্ঞান, ভক্তি ও রুচির সুন্দর সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ গানে জীবন্মুক্তির এই পরমানন্দ শিল্প সমৃদ্ধ বাণীভঙ্গিতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সর্বোপরি মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, চরিত্র পর্যালোচনায় বিভিন্নভাবের উদ্‌বোধনে তিনি অসামান্য শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন।

কেশব ভবনে স্বস্তিকার পূজাসংখ্যা প্রকাশ এবং লেখক সম্মেলন

গত ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেলে মানিকতলাস্থিত কেশব ভবনের সভাকক্ষে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা (১৪৩১) প্রকাশ উপলক্ষ্যে লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রথিতযশা নামি-দামি লেখকদের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের নব্য লেখকদের মেলবন্ধন ঘটে। গুরুগম্ভীর আলোচনা বা বক্তব্যের পরিবর্তে ছিল 'সাহিত্যিক আড্ডা'।

সাপ্তাহিক সংখ্যাগুলিতে থাকা সমাজ তথা রাষ্ট্র বিষয়ক বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী লেখার পাশাপাশি রম্যরচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্পের সমাহারে সমৃদ্ধ থাকে এই পূজাসংখ্যা।

এই দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীমতী এষা দে, দেবযানী ভট্টাচার্য, সুজিত রায়, বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. নারায়ণ চক্রবর্তী-সহ বহু বিশিষ্ট লেখক উপস্থিত ছিলেন। 'এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন' সমবেত সংগীত এবং প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন কয়েকজন প্রবীণ লেখক। পত্রিকার সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের ভূমিকা করেন এবং তার পরেই স্বস্তিকা পূজা সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। সঞ্চালক দীর্ঘ ৭৭ বছর ধরে চলতে থাকা এই পত্রিকার সেকাল-একালের পরিবর্তন যাত্রাতে বিভিন্ন জনের অবদানে কথা উল্লেখ করে সমাজ পরিবর্তনে তথা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখকদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে প্রত্যেকের অভিমত ব্যক্ত করার আহ্বান জানান। 'শারদীয়া সংখ্যা' নয় 'পূজাসংখ্যা' শব্দটাই গ্রহণযোগ্য, এছাড়াও 'বাদ' (ইজম্) শব্দের পরিবর্তে 'বোধ' (রিয়ালাইজেশন) শব্দের যথার্থতা বিষয়ে অনেকেই যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। এমনই নানান বিষয়ে ঘণ্টাখানেক আলোচনা চলে। প্রবীণ লেখক, সাহিত্যিকদের পাশাপাশি নবীনদেরও উৎসাহপূর্ণ অংশগ্রহণে লেখক-সাহিত্যিকদের সম্মেলনটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। অন্তিমপর্বে লেখক শিবেন্দ্র ত্রিপাঠীর কণ্ঠে 'দেবী আমার ধাত্রী আমার পুণ্য ভারতভূমি' গানের পর ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন। তারপর সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

তাজপুর সারদা ভবনে মধ্যবঙ্গ প্রান্তের গ্রাম বিকাশ গতিবিধির কর্মশালা

গত ২৮,২৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার কামারপুকুর খণ্ডের তাজপুর সারদা ভবনে মধ্যবঙ্গ প্রান্তের গ্রামবিকাশ গতিবিধির কর্মশালা সম্পন্ন হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে কর্মশালার উদ্বোধন করেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল। উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্রের গ্রামবিকাশ সংযোজক অশোক পাড়ি, মধ্যবঙ্গপ্রান্ত গ্রামবিকাশ মার্গদর্শক তথা প্রবীণ প্রচারক সনৎ কুমার বসুমল্লিক, প্রান্ত সংযোজক সৌমেনকান্তি দাস, সহ সংযোজক দিলীপ পাল।

কর্মশালায় ৭জন মহিলা-সহ ৩৫ জন কার্যকর্তা এবং ৪জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের হিন্দি দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ সেপ্টেম্বর 'হিন্দি দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে বড়বাজার কুমারসভা। উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান নন্দকুমার লোঢা, শ্রীমোহন তেওয়ারি ও সত্যপ্রকাশ রায়। অরবিন্দ তেওয়ারির কণ্ঠে সরস্বতী বন্দনার মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ইউকো ব্যাংকের রাজভাষা প্রমুখ অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। সভাপতি হিসেবে তাঁর বক্তব্যে তিনি একটি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বিষয়ক মৌলিক সাহিত্য হিন্দি ভাষায় রচিত না হওয়ার কারণে হিন্দি ভাষার ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হতে চলেছে বলে তিনি উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে সাম্প্রতিককালে হিন্দি বলার ক্ষেত্রে হিন্দিভাষীদের সংকোচ ও ইতস্ততভাব আত্মমর্যাদাহীনতার পরিচায়ক। হিন্দিতে বাক্যালাপের ক্ষেত্রে সংকোচমূলক এই প্রবৃত্তি স্বাভিমানহীনতা থেকে উৎপন্ন বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ রেশমী পাণ্ডা মুখার্জি। তিনি বলেন, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তর ও কার্যালয়গুলিতে আজ হিন্দির ব্যবহার ও প্রয়োগ যে শুরু হয়েছে, তার পিছনে 'হিন্দি দিবস'-এর বড়ো মাপের অবদান রয়েছে। হিন্দি ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও টান থাকলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিন্দি প্রসার লাভ করবে বলে তিনি জানান। বিশিষ্ট বক্তা পরমজিৎ পণ্ডিত বলেন যে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষজনকে সংগঠিত করতে পারে হিন্দি ভাষাই। হিন্দি তাঁদের হৃদয়ের ও প্রাণের ভাষা বলেই তাঁরা ঐক্যবদ্ধ। বংশীধর শর্মা, কামায়নী সঞ্জয়, কৃষ্ণা সিংহ, পরী সিংহ, আশুতোষ কুমার রাউত, বিবেক তেওয়ারি, গরিমা দুবে, ওঙ্কার ব্যানার্জি, সুধাংশু পাণ্ডেয়, পূজা প্রসাদ, কুমার তেজসের মতো বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিকরা এই অনুষ্ঠানে বিবিধ রসাত্মক নানা কবিতা আবৃত্তি করেন। উপস্থিত শ্রোতারা করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপিকা দীক্ষা গুপ্তা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ কমল কুমার। মহাবীর বাজাজ, মহাবীর প্রসাদ রাওয়াত, দুর্গা ব্যাস, বেদপ্রকাশ গুপ্তা, সত্যপ্রকাশ দুবে, রবিপ্রতাপ সিংহ, সীতারাম তেওয়ারি, রামপুকার সিংহ, জীবন সিংহ, বিনোদ যাদব, মনীষ জৈন, রাজেন্দ্র কানুনগো, গোবিন্দ জৈথলিয়া, প্রদীপ ধানুক, ওমপ্রকাশ চৌবে, গায়ত্রী বাজাজ, অরুণ সিংহ প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সভাঘরটি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

হাওড়ার পানিহিজলী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে হাজার কণ্ঠে শ্রীহনুমান চালিসা পাঠ

হাওড়া গ্রামীণ জেলার স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রীয় যুব বাহিনীর উদ্যোগে গত ২২ সেপ্টেম্বর হাজার কণ্ঠে শ্রীহনুমান চালিসা পাঠের আয়োজন হয়। পাঁচলা থানার পানিহিজলী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকর্তা এবং সাধারণ নাগরিক মিলিয়ে এক হাজারের অধিক মানুষের উপস্থিতিতে শ্রীহনুমান চালিসা পাঠ সুন্দরভাবে

সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী মহাদেবানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের স্বামী শুদ্ধগুণাত্মানন্দজী মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত বিভাগ প্রচারক পরিতোষ দে, প্রজ্ঞাপ্রবাহের লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, ধর্মজাগরণ বিভাগের তারক নস্কর এবং ক্রীড়া ভারতীর পক্ষ থেকে শুভেন্দু সরকার। শ্রীহনুমান চালিসা পাঠের মাধ্যমে সকলের মধ্যে দেশপ্রেম এবং ঈশ্বরের প্রতি অটুট ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠুক— এই বার্তাই বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক

গত ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ (স্কুল শিক্ষা) রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক বীরভূম জেলার তারাপুর সরস্বতী শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের ১৮টি জেলা থেকে রাজ্য সমিতি, বিভাগ এবং জেলা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও মহিলা প্রমুখ মিলিয়ে মোট ৬২ জন কার্যকর্তা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক-সহ রাজ্যের অন্যান্য প্রবীণ কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে রাজ্যের সমস্ত জেলার গত তিন মাসের কার্যসমীক্ষা, আগামী চার মাসের সংগঠনের কর্মসূচি তৈরি, সংগঠনের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, রাজ্যব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে করণীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়। আগামী চার মাসে জাতীয় শিক্ষা নীতির ওপর ভিত্তি করে পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে কার্যশালা, প্রধান শিক্ষক সম্পর্ক, শিক্ষক সমাবেশ, অভ্যাস বর্গ, বৌদ্ধিক প্রবোধন বর্গ, মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি--- অভীক্ষা-সহ নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক গত দুই মাসে রাজ্যে সদস্যতা অভিযান এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন- ভিত্তিক কার্যক্রমের বিশ্লেষণ করেন এবং আগামী চার মাসের কর্মসূচির যোজনা নিয়ে আলোচনা করেন। রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল বলেন, 'আমাদের এই সংগঠন শিক্ষাক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রীয়তার বৈচারিক অধিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয়ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনকারী একটি সংগঠন। আমরা শিক্ষা ও সমাজ হিতের মাধ্যমে দেশের জাতীয় সংকল্পনাকারী। শিক্ষকদের পেশাগত অবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যে সমাজ হিতকারী যোজনা সমূহ নির্মাণ, বাস্তবায়ন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সর্বদা ক্রিয়াশীল মনোভাব তৈরি সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য'।

ত্রিপুরায় বিশ্বকর্মাপূজা এবং জাতীয় শ্রম দিবস উপলক্ষ্যে বিএমএসের সভা

গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা জয়ন্তী এবং জাতীয় শ্রম দিবস উপলক্ষ্যে বিএমএস, ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে আগরতলা রবীন্দ্র ভবনের ২ নং হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভাষণ দেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্রিপুরা প্রান্ত প্রচারক নিখিল নিবাস কর। এই উপলক্ষ্যে একটি আলোচনাসভাও অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় বিএমএস, ত্রিপুরা প্রদেশের সভানেত্রী দেবশ্রী কলই এবং সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার দে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে দেবশ্রী কলই বিএমএস স্বীকৃত সকল ইউনিয়নকে আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের পরামর্শদান করেন। শ্রম দিবসের তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে নিখিল নিবাস কর নাতিদীর্ঘ ভাষণের মাধ্যমে বিএমএসকে আরও সক্রিয় হওয়ার উপর বিশেষ জোর দেন। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধাঁচে বিএমএসের সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উত্তরের সংস্কার ভারতীর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর মালদহ শহরের অরবিন্দ পার্কস্থিত সরস্বতী শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো উত্তরের সংস্কার ভারতী, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা, ২০২৪। উত্তরের সংস্কার ভারতীর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি তথা পূর্বক্ষেত্রের প্রভারী ড. ধনঞ্জয় কুশরেজী, পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ অধীর নীলকণ্ঠ রায়, প্রান্ত সভাপতি বিপ্লব দেব, প্রান্ত কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় কুমার নন্দী, প্রান্ত সম্পাদক বিকাশ কুমার ভৌমিক, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস এবং অন্যান্য পদাধিকারী সদস্য-সদস্যা। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বর্তমান সাংগঠনিক ব্যবস্থা : মোট বিভাগ পাঁচটি— উত্তর মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, শিলিগুড়ি ও কোচবিহার। জেলা ১৩টি (প্রশাসনিক ৯টি), চর্চাকেন্দ্র ২৫টি, প্রস্তাবিত ৬টি। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২০৭ জন। ২০২৪-'২৫ বর্ষে যা যা করা হবে— কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ শিবির, প্রান্তের মুখপত্র প্রকাশ, প্রতিটি বিধার একটি করে কার্যশালা, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

এই বর্ষে নতুন প্রান্ত সমিতি নির্বাচিত হলো। প্রান্ত সভাপতি হলেন বিপ্লব দেব, প্রান্ত সম্পাদক বিকাশ কুমার ভৌমিক, প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ কিশোর কুমার সরকার। আগামীদিনে জয়পুরের কেন্দ্রীয় বৈঠকের পর বাকি পূর্ণাঙ্গ সমিতি ঘোষণা হবে। এই প্রান্ত বার্ষিক সভা সুচারুভাবে পরিচালনা করেন কিশোর কুমার সরকার, পরেশ চন্দ্র সরকার, সজল দত্ত, শুভঙ্কর দাস, কৌশিক দাসবক্সী, জয় রায়চৌধুরী ও অন্যান্য সদস্য-সদস্যা। সম্মেলন শেষে সমাপ্তি ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ড. ধনঞ্জয় কুশরেজী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কিশোর কুমার সরকার।

তারকেশ্বরের গ্রামে সঙ্ঘের সেবা বিভাগের উদ্যোগে চিকিৎসা শিবির

গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার সেবা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এবং 'ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশন' পশ্চিমবঙ্গের সহযোগিতায় নতিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গণেশপুর এবং চিংড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চিংড়া গ্রামে দুটি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। দুটি শিবিরে ৭জন চিকিৎসক এবং ১৮ জন সহযোগির ব্যবস্থাপনায় ৯টি গ্রামের ২৮৬ জন রোগীর চিকিৎসা করে তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর বন্যাকবলিত মানুষের সাহায্যার্থে অনুরূপ একটি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয় খানাকুল-২ ব্লকের (রাজহাটি খণ্ড) মারোখানা গ্রামপঞ্চায়েতের সুন্দরপুর গ্রামে। শিবিরে ৪টি গ্রামের ২২৬ জন মানুষের চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। ২ জন চিকিৎসক, ১ জন ফার্মাসিস্ট ২৫ জন সহকারীর সহযোগিতায় এই শিবির পরিচালিত হয়। শিবির শেষে জেলা সঙ্ঘচালক ডাঃ অরূপ কুমার দাস, সহ জেলা কার্যবাহ-সহ বেশ কয়েকজন কার্যকর্তা বন্যার্তদের সঙ্গে দেখা করে তাদের খোঁজখবর নেন এবং সমস্ত রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ফঃ ৪

বেলডাঙ্গায় সীমান্ত চেতনা মঞ্চের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত অধিবেশন

গত ১০ সেপ্টেম্বর সীমান্ত চেতনা মঞ্চের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের অধিবেশন মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙা শাখার অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। অধিবেশনে তাঁর বক্তব্যে মহারাজ বলেন, একসময় সীমান্তের গ্রামে লোকেদের রান্নাঘর বাংলাদেশে ছিল, তাঁরা ভারতে ঘুমাতেন। জলঙ্গীতে সীমা সুরক্ষারত বিএসএফ জওয়ানকে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা মেরে চলে যায়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কট্টর হিন্দুকে বসাতে হবে। ত্রিপুরাতে সীমান্ত সুরক্ষিত না থাকায় সঙ্ঘের চার জন প্রচারককে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে জঙ্গিরা। তিনি বলেন ভারতমাতা কী ছিলেন, কী হয়েছেন এবং কী হবেন তা আমাদের জানতে হবে। মুর্শিদাবাদে ৭০ শতাংশ মুসলমান থাকার পরেও আমরা চিন্তা করি না। বিএসএফ এবং সীমান্ত নাগরিকদের একসঙ্গে সীমা সুরক্ষার কাজ করে যেতে হবে। সীমা জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজক রাম কুমারজী বলেন যে ধর্মের হানি হলে ভগবান অবতীর্ণ হন। আগে দেশীয় রাজার হাতে ক্ষমতা ছিল, পরে বিদেশি ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা যায়। অনেক বলিদানের ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে সীমান্ত সুরক্ষা খুবই প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে অখিল ভারতীয় সংযোজক মুরলীধরজী, পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক গণেশ পাল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রবীর বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি তাপস বিশ্বাস জেলা সভাপতির নাম এবং প্রান্ত সমিতি ঘোষণা করেন। তাঁর ঘোষণার পর অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

হাওড়ায় ক্রীড়া ভারতীর জেলা কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলার ক্রীড়াভারতীর জেলা কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো হাওড়া জেলার পাঁচলা ব্লকের পানিহিজলীতে অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। এই বর্গে বিভিন্ন জেলা থেকে কার্যকর্তা এবং বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ-সহ প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। ক্রীড়াভারতীর সর্বভারতীয় সভাপতি অলিম্পিয়ান, স্বর্ণপদক বিজয়ী, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যাথলিট গোপাল সৈনী এই প্রশিক্ষণ বর্গে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের সম্পাদিকা জয়ন্তী মণ্ডল এবং সহ-সম্পাদক খড়্গপুর আইআইটি ক্রীড়া বিভাগের অধ্যাপক, কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তোলনে রৌপ্যপদকজয়ী, অন্যান্য প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কৌস্তভ ঘোষ-সহ প্রান্তের সকল কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এই বর্গে। কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় সভাপতি গোপাল সৈনী বলেন যে দেশপ্রেমিক খেলোয়াড় তৈরি এবং গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ক্রীড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক ক্রীড়াবিদ তৈরি করার দায়িত্ব ক্রীড়াভারতীর কার্যকর্তাদের নিতে হবে। যা আগামী দিনে পরম বৈভবশালী ভারত নির্মাণে সহায়ক হবে।

শিলিগুড়িতে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত অধিবেশন

গত ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর, শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হলো সীমান্ত চেতনা মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের 'প্রান্ত অধিবেশন'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রান্ত সভাপতি প্রদীপ চন্দ সবাইকে স্বাগত জানান। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সমিতির আমন্ত্রিত সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে সীমান্ত সম্পর্কিত কাজ প্রথম শুরু করেছিলেন মনমোহন রায়। তিনি 'সীমান্ত শান্তি ও সুরক্ষা সমিতি' নামে সংগঠন শুরু করেছিলেন। সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন কলকাতার নরেশ রায়। ব্যারিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারও যুক্ত হয়েছিলেন। পরে অখিল ভারতীয় রূপ দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন যে আমাদের পড়শি দেশ বার্মা, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তিব্বত ভারতের অংশ ছিল। যা আজ বিদেশ হয়ে গিয়েছে। ভারত আর যাতে খণ্ডিত না হয় সেই লক্ষ্যে সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে কাজ করছে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ। তিনি বলেন যে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ, ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সব সময় সহযোগিতা করেছিল। অধিবেশনের প্রধান অতিথি অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক অমলকান্তি রায় বলেন, তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় চাকরি করার সময় বিশেষভাবে সীমান্ত সুরক্ষার দিকে নজর দিতেন। তিনি আরও বলেন, ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা করেছিল। যার পরিণামে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজন হয়। সীমা জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজক রাম কুমারজী বলেন ভারতের উত্তরে রয়েছে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র। সুরক্ষার দিক থেকে ভারতবর্ষকে ভগবান এক অন্যরূপে বানিয়েছেন। হাজার বছর পরাধীন থাকার পর দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতাকে কোনোভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। তার জন্য নিরন্তর সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, যে কাজ সীমান্ত চেতনা মঞ্চ করে যাচ্ছে। অধিবেশনে অখিল ভারতীয় সংযোজক মুরলীধর বিন্দ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক গণেশ পাল উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক চিন্ময় চৌধুরী সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সকলের জন্য দীপাবলীর শুভেচ্ছা রইল—

—: সৌজন্যে :—

সৌরভ ঘোষ

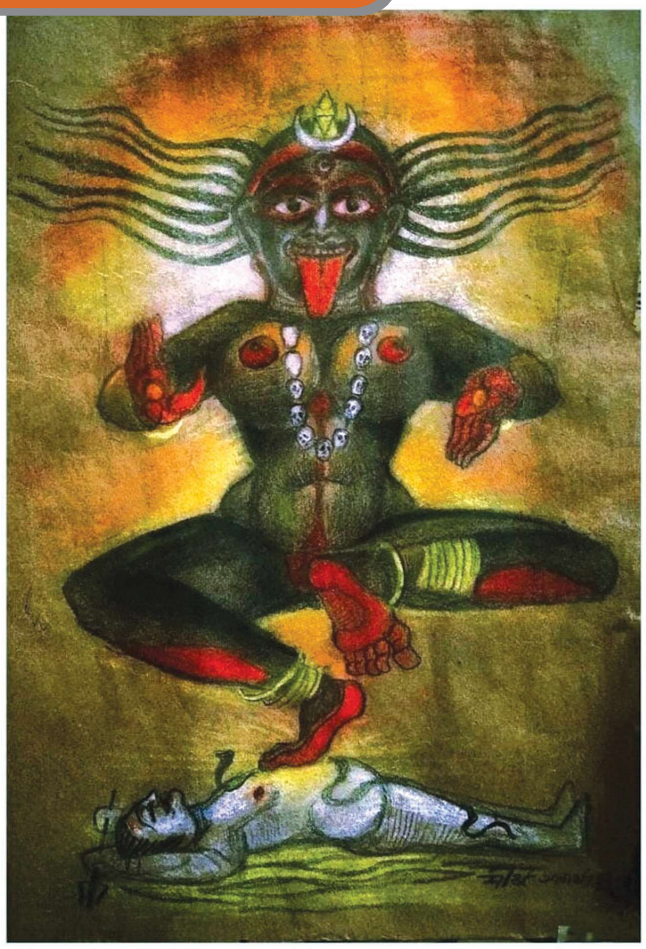

স্বামীজীর কালীভাবনার অনুসন্ধানে নিবেদিতা ও শরচ্চন্দ্রের লেখনী

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

স্বামীজীর চরিত্র চিত্রাঙ্কন অনেকেই করেছেন। তবে ভগিনী নিবেদিতা এবং শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর চিত্রাঙ্কনে বিবেকানন্দকে আমরা যেভাবে পাই আর কারও নিকট তা পাই না। কারণ স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁরা কেবল পর্যবেক্ষণই করেননি, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি পা ফেলাকে নিরীক্ষণ করেছেন। যে চোখে তাঁরা স্বামীজীকে দেখেছেন, যে উচ্চভাবে, অনুপম ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন, আর কেউ বোধহয় তা পারেননি। তাঁদের মধ্যে তাই স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে প্রতিভাত হয়ে আছেন, তা যদি দেখা না হয়ে থাকতো, হয়তো সেই সমুদয় অনুভব অজানাই থেকে যেত। তাই স্বামীজীর কালীভাবনার অনুসন্ধানের মধ্যে যে তাঁদেরও যথাযথ ভাব-অনুভব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে, তা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি এই অনুসন্ধানের মধ্যে আমরা তাঁদের নিজস্ব ভাবনাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

প্রস্তুত আলোচনার শুরুতে 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে শরচ্চন্দ্র-বিবৃত স্বামীজীর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯০১ সালে দুর্গাপূজার পর স্বামীজী বেলুড় মঠে প্রতিমা আনিয়ে শ্যামাপূজা যথাশাস্ত্র নির্বাহিত করেছিলেন। এই পূজার পর স্বামীজী ১৯০১ সালের নভেম্বর মাসে আপন গর্ভধারিণীর নির্বন্ধাতিশয়ে তাঁর সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে তাঁরই বহু আগে মানত করা পূজাটি সম্পন্ন করিয়ে দেন।

শরচ্চন্দ্রের লেখাতে পাই, বাল্যকালে স্বামীজী একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। তখন মা ভুবনেশ্বরী দেবী মানত করেন, আদরের বিলে আরোগ্যলাভ করলে নিজে কালীঘাটে পুত্রকে নিয়ে গিয়ে বিশেষ পূজা দেবেন এবং মন্দির চত্বরে গড়াগড়ি দিইয়ে নেবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এবং পরিবারের অন্যান্যরা তা একদম বিস্মৃতই হয়ে যান। শেষ জীবনে স্বামীজী যখন প্রচণ্ড অসুস্থ, মায়ের স্মরণে আসে সেই আগেকার মানতের কথা। মা ব্যস্ত হয়ে পড়েন, মঠে খবর পাঠান তিনি। স্বামীজী মায়ের ডাকে সাড়া দিলেন। মায়ের সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে কালীগঙ্গায় স্নান করে ভেজা পোশাকে মন্দিরে প্রবেশ করলেন তিনি। শরচ্চন্দ্রের লেখায় পাই, "...মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীকালীমাতার পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন। তৎপরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। পরে নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। অমিত বলবান তেজস্বী সন্ন্যাসীর সেই

যজ্ঞসম্পাদন দর্শন করিতে মায়ের মন্দিরে সেদিন খুব ভিড় হইয়াছিল। ...জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুনঃপুনঃ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া সেদিন স্বামীজী দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন।" এই আলোচনার শেষে শরচ্চন্দ্র লিখলেন স্বামীজীর সেই দীপ্ত ঘোষণার কথা, 'I have come to fulfill and not to destroy.' 'আমি শাস্ত্রমর্যাদা নষ্ট করিতে আসি নাই, পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।' যাঁরা স্বামীজীকে শুধুমাত্র বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে নির্দেশ করেন, এই পূজানুষ্ঠান তাঁদের বিশেষরূপে ভাবিয়ে তুলেছে। জীবনের শেষভাগে এসে স্বামীজী হিন্দুর অনুষ্ঠেয় পূজাপদ্ধতির প্রতি আন্তরিক ও বাহ্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। এই কথাটি নিবেদিতার লেখনীতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে।

নিবেদিতা লিখলেন, স্বামীজীর শক্তিপূজার উল্লেখ ছাড়া তাঁর বিবরণ নিতান্তই অসম্পূর্ণ। যে স্বামীজীর কাছে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই একমাত্র লক্ষ্য, অদ্বৈতদর্শন সর্বোত্তম মতাদর্শ এবং বেদ ও উপনিষদ একমাত্র প্রমাণ্য গ্রন্থ; সেই স্বামীজীর মুখেই সবসময় লেগে থাকতো জগন্মাতাবোধক 'মা', 'মা' শব্দ। পরিবারে অত্যন্ত পরিচিত কারও সম্পর্কে যেমন কথা বলা হয়, জগন্মাতাকে স্বামীজী ঠিক সেইভাবেই উল্লেখ করতেন, সবসময় তাঁর চিন্তাতেই তন্ময় থাকতেন। শুভ অশুভ যা ঘটুক সকলই যেন জগন্মাতার ইচ্ছায় সম্পন্ন হচ্ছে, আর কেউ দায়ী নন।

১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে ভগিনী নিবেদিতা কাশ্মীরের ক্ষীর ভবানী মন্দির দর্শন করেছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে। দর্শন শেষে তিনি দেখেছিলেন স্বামীজীর তুরীয় অবস্থা, এক প্রগাঢ় মানসিক অভিভব। সেই মৌলিক ভাবপ্রেরণায় ওই বছর সেপ্টেম্বরে লিখলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শাক্ত কবিতা মৃত্যুরূপা মাতা, 'Kali the Mother'. তারপর এক এক করে লিখে চললেন মৃত্যুরূপা কালীর কথা; 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'My play is done', 'Who knows how Mother plays'. ঠিকই তো! জগজ্জননীর অনন্তলীলার কে কবে তল পেয়েছে? 'কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালোবাসা?' হৃদয়কে শ্মশান করে তুলে, স্বার্থ-সাধ-মানকে চূর্ণ করে সেখানে নাচাতে চান শ্যামামাকে। মৃত্যু, অন্ধকার, সংগ্রাম ও দুঃখচেতনার অন্তর্নিহিতি জারিত করেছিল ভগিনীকেও। নিবেদিতার বর্ণনায় পাই, এক শিষ্যকে স্বামীজী একটি মাতৃ-প্রার্থনা শিখিয়ে দিয়ে বলছেন, মায়ের কাছে দীনহীনভাব চলবে না। কেবল প্রার্থনা নয়, মা'কে জোর করে তা করাতে হবে। নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন, মা কালীর চিন্তা করতে করতে স্বামীজী বলে উঠতেন, 'তাঁর শাপই বর।' মায়ের ডান হাত বরাভয় প্রদানের জন্য উত্তোলিত, বামহাতে ধৃত খড়্গ। বলতেন, 'আমি ভয়ংকরা রূপের উপাসক।' শিষ্যদের উপর মতামত চাপিয়ে না দিয়েও স্বামীজী আহ্বান করতেন, ভয়ংকরা মায়ের জন্যই যেন আমরা তাঁর ভয়ংকরা মূর্তির উপাসনা করি। বলতেন, এটা ভুল ধারণা যে, সকলেই সুখের আশায় কর্মে প্রবৃত্ত হন, বহুলোক জন্মাবধি দুঃখকে খুঁজে বেড়ান। তাঁরা আজন্ম মায়ের অসি-মুণ্ড বরাভয় মূর্তির উপাসক। ভাবাবেগে বলতেন, 'অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিভৃত হৃদয়কন্দরে মায়ের রুধিররঞ্জিত অসি ঝকমক করে।' এই ভাবনা পোষণ করতেন বলেই স্বামীজী লিখতে পেরেছিলেন মৃত্যুরূপা মাতা, Kali the Mother, 'Who dares misery love,/And hug the form of Death,/Dance in Destruction's dance,/To him the Mother comes.' (সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,/কাল-নৃত্য করে উপভোগ,/মাতৃরূপা তারি কাছে আসে)। এ যে ভয়ংকরের পূজা! এ মৃত্যুর পূজা, এ যে কাপুরুষের আত্মহত্যা নয়! এ যে শক্তিমানের মৃত্যু সম্ভাষণ! তাঁর ভাষা কঠোর, 'জীবন না চাহিয়া মৃত্যুকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, নিজেকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিতে হইবে, চিরকালের জন্য ভয়ংকরা মূর্তির সহিত একাত্ম হইতে হইবে।' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীরা তাঁর এই ভাব গ্রহণ করেই শক্তিমান হয়েছিলেন।

একবার নিবেদিতা মন্দিরের পশুবলি সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হলেন। বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি শুনে স্বামীজী স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন, 'চিত্রটি নিখুঁত করবার জন্য হলোই-বা একটু রক্তপাত!' 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ'-এও শরচ্চন্দ্রকে তিনি বলছেন (১৯০১ সালে), ''এবার ভালো হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজা করব! রঘুনন্দন বলেছেন, নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্— এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা করতে হয়। তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মা'র ছেলে বীর হবে— মহাবীর হবে! নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।"

শরচ্চন্দ্রের বর্ণনায় আছে, এক অমাবস্যায় কালীপূজার দিন বেলুড় মঠে জানালা দিয়ে পূর্বাকাশে তাকিয়ে অন্ধকারের অদ্ভুত গম্ভীর শোভা আর তিমিররাশি দেখতে দেখতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন স্বামীজী। গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠিত বহিঃপ্রকৃতির নিস্তব্ধতা স্বামীজীর মধ্যে আনলো এক অদৃষ্টপূর্ব গাম্ভীর্য। এই আবহে স্বামীজী ধীরে ধীরে গাইতে লাগলেন, 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।' আর বলতে লাগলেন, মা মা, কালী, কালী। পরে গাইলেন, 'কখন কী রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।' সংগীত শেষ করে সেদিন শিষ্যকে বললেন গভীর তাত্ত্বিক

কথা, ‘এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, সাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব।’

নিবেদিতার কাছে স্বামীজী স্বীকার করেছেন, ‘মা-কালী ও তাঁর লীলাকে আমি কী ঘৃণাই করেছি! ছ’-বছর ধরে ওই নিয়ে সংগ্রাম করেছি, কিছুতেই তাঁকে মানব না। শেষে কিন্তু আমাকে মানতেই হলো! শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, আর এখন আমি বিশ্বাস করি, অতি সামান্য কাজেও সেই মা আমাকে পরিচালনা করছেন, আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করছেন!’ কেন তাঁকে মানতে হলো, তা অত্যন্ত গুহ্য ব্যাপার, জীবনে কাউকে তা বলেননি। তখন তাঁর ‘অতি দুঃসময়’, ‘মা সুবিধা পেলেন’, তাঁকে গোলাম করে ফেললেন। ঠাকুরও যে তাঁকে মায়ের হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। ঠাকুরের নিজ মুখে কথা, ‘তুই মায়ের গোলাম হবি।’

স্বামীজীর মতে ভাবীযুগ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে অবতারবরিষ্ঠায় বা মা-কালীরই শ্রেষ্ঠ সন্তান বলবে। মা তাঁর নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন, ‘আমার ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি আরম্ভ হয় কালীপূজার দিন। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং প্রতিষ্ঠাকালীন পূজাদি সম্পন্ন করিলেন। পূজান্তে তিনি মৃদুস্বরে বিদ্যালয়ের ভাবী ছাত্রীদের উদ্দেশে আশীর্বাণী করিলেন; গোলাপ-মা স্পষ্ট করিয়া উহা সমবেত সকলকে শুনাইয়া দিলেন, ‘শ্রীশ্রীমা প্রার্থনা করছেন, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।’

স্বামীজীর কাছ থেকে বহু আগে নিবেদিতা শুনেছিলেন, ‘ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্যে দিয়ে দেখলে নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণরূপে প্রতিভাত হন।’ ব্রহ্ম ও কালী বিষয়ে বহু আলোচ্য বিভেদের মীমাংসা পাই স্বামীজীর আরও একটি কথায়, ‘কোথাও এমন এক মহাশক্তি আছেন, যিনি নিজেকে প্রকৃতি-সত্তা বলে মনে করেন। তাঁরই নাম কালী, তাঁরই নাম মা!... শরীর মধ্যস্থিত অসংখ্য কোষ (cells) মিলিত হয়েই এক ব্যক্তি সৃষ্টি করে না কি? এক নয়, বহু মস্তিষ্ককেন্দ্রই কি মনের অভিব্যক্তি ঘটায় না? বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেই একত্ব— এই আর কী! তবে ব্রহ্মের বেলায় অন্যরূপ হবে কেন? ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ, তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনিই আবার দেব-দেবীতে পরিণত!’

স্বামীজীর মতে মা যেন একখানি মহাগ্রন্থ; মা-কালীই হবেন ভারতের ভাবীযুগের বংশধরের একমাত্র উপাস্য। তাঁকে পাঠ করে মাতৃভক্তরা নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন এবং তাঁর নাম নিয়ে অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় উপনীত হবেন। স্বামীজীর এই মাতৃ-ভাবনাকে নিবেদিতা গ্রহণ করেছেন। গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করে তাই তিনি বলেছেন, কর্ম আরম্ভ না করে কোনো ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারেন না। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই অন্তিমে সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটে। শক্তির মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মে উপনীত হতে হয়। নতুন জীবন, নতুন নতুন জ্ঞান, অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই আমরা আত্মারূপী চিরধামে পৌঁছে যাই। সেখানে সবটাই এক অখণ্ড সত্তা উপস্থাপিত, এক পরিপূর্ণ শান্তি। স্বামীজীর সঙ্গে নানান আলোচনা, কথাবার্তা ও ভাষণ, কালীমূর্তির ব্যাখ্যা উপলব্ধি করে নিবেদিতার ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, স্বামীজী জীবনচর্যায় এবং মানসচর্চায় অভিজ্ঞতারূপ মহাগ্রন্থের পাতাগুলি উলটিয়ে গেছেন, যে মহাগ্রন্থটিই আসলে মা-কালী এবং গ্রন্থের শেষ শব্দটি পড়া হওয়ামাত্র তিনি চলার ক্লান্তিতে শ্রান্ত শিশুর মতো মা-কালীর ক্রোড়ে শয়ন করে মহাসমাধিতে মগ্ন হয়েছেন। এই সমাধিতে, আপনার শুভ মুহূর্ত উদয়ের কালে তাঁর জ্ঞান হয়েছে, এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জীবন স্বপ্নমাত্র।

১৮৯৯ সালের নভেম্বরে স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে যাত্রাকালে নিবেদিতা গভীরভাবে জেনে নিয়েছিলেন কালীদর্শন। আর তিনিও লিখলেন, ‘Kali the Mother’, এ যেন মনোময়ী কালী, একেবারেই নিবেদিতার নিজস্বতার ছোঁয়ায়। তার আগেই স্বামীজী নিবেদিতাকে দিয়ে বঙ্গদেশে কালীতত্ত্ব প্রচার করিয়ে নিয়েছেন। ১৮৯৮ সালের ১১ মার্চ কলকাতার স্টার থিয়েটারে নিবেদিতা বক্তা, ১৮৯৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি অ্যালবার্ট হলে, ১৮৯৯ সালের ২৮ মে কালীঘাট মন্দিরে। গুরুকৃপায় নিজের উপর নিবেদিতার বিশ্বাস যখন পুরোদমে, তখনই লিখলেন Kali the Mother। তাঁর কালী ভাবনার মধ্যে ফুটে উঠলো মানুষের মনের বিপুল শক্তির আলোড়নের প্রতিচ্ছবি, কালী-সদাশিবের তত্ত্ব। লিখতে পারলেন এই জন্যই যে, ততদিনে ‘তার খ্রিস্টীয় সংস্কারের ওপরে কালীর ওই কৃষ্ণছায়াপাত’-এর সূচনা হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের পরত সরে যাচ্ছে তাঁর কাছে, যেন কোনো লাস্যময়ীর লীলাচাতুরীর হালকা ওড়নার ঢাকা সরে যাচ্ছে।

সৃষ্টির মিলন কোথায়? শায়িত ঈশ্বর বা শিবের আবেগগ্রস্ত দৃষ্টির সঙ্গে দেবীর নয়নের মিলন। পদদলিত হয়েও প্রেমাবিষ্ট নয়নে দেখছেন শায়িত ঈশ্বর। যে শিব-কালী সাধনাকে জাতি-গঠনের কাজে লাগানোর কথা বলেছেন স্বামীজী, সেই শিব-কালীকে ভারতের চৈতন্য হিসেবে রূপায়িত করলেন নিবেদিতা। ভয়ংকরী কালী যেন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ নারীর ভয়ংকর সমর্পণভাবের উৎস! □

‘ডুব দে রে মন কালী বলে’

ড. রামানুজ গোস্বামী

কালী বা দেবী কালিকা রহস্যময়ী। কালীতত্ত্ব তাই সর্বসাধারণের কাছে অতি কঠিন ও রহস্যাবৃত। বহু শাস্ত্রে, বহু পুরাণে এবং বিভিন্ন মতে নানাভাবে আদ্যাশক্তি মহামায়ার এই কৃষ্ণবর্ণা রূপটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হিন্দু দেব-দেবী প্রায় সকলেই হয় শ্বেতবর্ণা নয়তো বা উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। ব্যতিক্রম কেবল দেবী কালিকা। তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা।

কালীর রূপটি একটু চিন্তা করা যাক। দেবী চতুর্ভুজা। তিনি দিগ্‌বসনা। নৃমুণ্ডমালিনী। তাঁর একটি হাতে সদ্যচ্ছিন্ন অসুরের মস্তক। দেবী কালিকা শ্মশানবাসিনী। অন্য দুই হস্তে বরাভয়। পদতলে মহাদেব শয়ান। এহেন দেবী লোলজিহ্বা। কালকে যিনি কলন করেন, তিনিই কালী। সৃষ্টি-ধ্বংসের মাধ্যমে আবর্তিত কালচক্রের নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী হলেন এই দেবী। দেবী বিবসনা, কারণ তিনি হলেন স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়া। তাঁর সাধনা জীবের পাশমুক্তি ঘটায়। পাশ অর্থে বন্ধন। তিনি ত্রিগুণাতীতা।

দেবী কালিকার পরমতত্ত্বে শিব যেন পুরুষের প্রতিমূর্তি। তিনি নিষ্ক্রিয়। সৃষ্টির কাজে প্রকৃতিরূপী কালীই প্রধানা। নিষ্ক্রিয় শিব শব রূপে পদতলে শয়ান। আবার দেবীর গলায় যে মুণ্ডমালা রয়েছে, তাতে একান্নটি মুণ্ড সন্নিবিষ্ট। এগুলি একান্নটি বর্ণের প্রতীক। জীবের চৈতন্য তথা চিৎশক্তির নির্ণায়ক। সাধক নিগূঢ়ানন্দজীর মতে, কালীর জিভ পরমাপ্রকৃতির ভারসাম্যের প্রতীক। তাঁর মতে বাম হস্তের সদ্যচ্ছিন্ন মুণ্ডটি একটি সৃষ্টির নির্দেশক। কোনো কোনো গবেষকের মতে কালীর জিহ্বা রসনাকে সংযত করার নির্দেশ প্রদান করে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযমের আগে আবশ্যক জিহ্বাকে বশে আনা। আহার, বাক্‌সংযম ইত্যাদি তো ইন্দ্রিয় সংযমের একেবারে গোড়ার কথা। দেবীর এই ভয়ংকরী মূর্তিতে যেন তারই নির্দেশ পাওয়া যায়। আবার কেউ কেউ এমনটাও মনে করেন যে, এটি আসলে রজোগুণের আধিক্যকে সত্ত্বগুণ দ্বারা দমন করাকেই বোঝায়। বহুবিধ তন্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্য ইত্যাদিতে দেবী কালিকার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বৈদিক যুগেও যে দেবীর অর্চনা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ আমরা মুণ্ডক উপনিষদে পাই। যজ্ঞ বা হোমের যে পবিত্র অগ্নি, তার সাতটি জিহ্বার নাম পাওয়া যায় এইভাবে— কালী, করালী, লোহিতা, মনোজবা, সুধুম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচা। এইভাবে বেদ-উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র-সবকিছুতেই কালীর বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বস্তুত আদ্যাশক্তি মহামায়া দেবী কালিকার তত্ত্ব তাই সকল শাস্ত্রসম্মত ও সর্বমত সমর্থিত একথা বলা যেতেই পারে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও রয়েছে কালীর কথা। তিনি দেবী কৌশিকীর ললাট থেকে উদ্ভূতা হয়েছিলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করে তাদের ছিন্ন মস্তক দেবী চণ্ডিকাকে উপহার দিয়েছিলেন। চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় আনয়নের জন্যই পৃথিবীতে দেবী কালিকা চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত। দুর্গাপূজায় মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা হয়। তা তো আসলে এই চামুণ্ডা রূপী কালীরই পূজা। আদ্যাশক্তি মহাশয়া হলেন আদিভূতা সনাতনী। তন্ত্রে নানা ধরনের আচার রয়েছে যেমন— পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচার। তাছাড়া পঞ্চ‘ম’কার তত্ত্বের কথাও তন্ত্রে অতি প্রসিদ্ধ। তবে প্রকৃত অর্থ না জেনে পঞ্চ‘ম’কার সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া অর্থহীন।

কালী হলেন সেই পরমা মহাশক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধনজগতের এত কঠিন তত্ত্বকে সহজ, সরল উপমা দ্বারা পৌঁছে দিলেন সাধারণ মানুষের কাছে। ঠাকুর বলছেন কালী তত্ত্বের কথা— ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটি মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।’

কী সুন্দর বর্ণনা। কত সহজ, কিন্তু সাধনজগতের গভীর কথাটি এতেই লুকানো আছে। কালী ব্রহ্মময়ী। এই কালী তমোগুণময়ী, তিনিই রজোগুণস্বরূপিণী দেবী মহালক্ষ্মী, সত্ত্বগুণময়ী মহাসরস্বতী। আবার তিনি কখনো সর্বগুণময়ী ত্রিগুণাত্মিকা। কেশবচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন, ‘যখন সৃষ্টি হয় নাই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার— তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী- মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।’ কালী তাই সাকারা, আবার নিরাকারা। মহামায়া সগুণা, আবার নির্গুণা। তিনি আবার একইসঙ্গে ত্রিগুণাতীতা। তাঁর থেকেই সৃষ্ট এ জগৎ। তিনি একদিকে আধার, আবার একদিকে আধেয় দুই-ই। তিনি জীবের যে সত্তা বা জ্ঞান, তাকে মোহাচ্ছন্ন করেন; আবার জীবকে তিনিই আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যে নিমজ্জিত করেন। এই মহামায়াই তো জগদীশ্বরী কালী। সমস্ত দেবতাই নানাভাবে, নানারূপে মায়েরই ধ্যান করে চলেছেন অবিরত। মা ছাড়া তো ত্রিভুবনে আর কিছুই নেই। মা যে ত্রিভুবনেশ্বরী।

নানা মতে, নানা তন্ত্রে নানা ভাবে দেবী কালীর পূজানুষ্ঠানের বিধি-বিধান রয়েছে। ভক্তি সহযোগে সেই সবের অনুসরণে মাতৃপূজা করাই বিধেয়। ভক্তিতেই মুক্তি পাওয়া যায়। তাই সবার আগে প্রয়োজন দেবীর প্রতি প্রকৃত ভক্তি; তাছাড়া মায়ের কাছে একান্ত শরণাগত হওয়াও প্রয়োজন। শরণাগতি হলো সেই সাধনা যার দ্বারা সহজেই মাতৃকৃপা লাভ করা যায়। তবে প্রকৃত শরণাগত হওয়া বড়ো বিষয়। কামনা-বাসনার লেশমাত্র থাকলেও তা সম্ভব হয় না। □

বিশ্বকল্যাণের সাধনায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কাজ করে চলেছে : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত

এবছর বিজয়াদশমীর পুণ্যলগ্নে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শততম বর্ষে প্রবেশ করছে। গত বছর শ্রীবিজয়া দশমী উৎসবে আমরা রানি দুর্গাবতীর ৫০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর উজ্জ্বল আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেছিলাম। এবছর পুণ্যশ্লোক অহল্যাবাঈ হোলকরের ৩০০ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। দেবী অহল্যাবাঈ ছিলেন একজন প্রজাবৎসল, কর্তব্যপরায়ণ এবং দক্ষ প্রশাসক। তিনি ছিলেন দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও স্বাভিমানসম্পন্না ব্যক্তিত্বের এক আদর্শ উদাহরণ। যুদ্ধনীতি সম্পর্কে প্রখর জ্ঞান তাঁকে একজন ব্যতিক্রমী শাসকে পরিণত করেছিল। প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজ্যের ভেতরে এবং রাজ্যসীমার বাইরে গিয়ে এক আশ্চর্য ক্ষমতাবলে তিনি যেভাবে বিভিন্ন তীর্থস্থানের সংস্কারসাধন এবং মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে সমরসতা নির্মাণ করে ধর্মসংস্কৃতি বজায় রেখেছিলেন তা আজকের দিনেও মাতৃশক্তি-সহ আমাদের সকলের কাছে অনুকরণীয়।

এবছর আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী। পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে কালের প্রবাহে নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক রীতিনীতিতে যে বিকৃতি এসেছিল তা দূর করে সমাজকে তার শাশ্বত মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ব্যাপক প্রচেষ্টা করেছিলেন। ভারতবর্ষের নবজাগরণের তিনিও একজন প্রেরণাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

রামরাজ্যের মতো পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যে ধরনের গুণ, চরিত্র এবং স্বধর্মের প্রতি আস্থা থাকা প্রয়োজন, সে ধরনের ব্যক্তি নির্মাণের জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গের পাবনার শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর একজন হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তাঁর মাতার দ্বারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তাঁর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে চরিত্রের বিকাশ ও সেবা ভাবনার মানসিকতার প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে 'সৎসঙ্গ' হয়ে ওঠে। ১৯২৫ সালে তা ধর্মীয় সংস্থা হিসেবে পঞ্জীকৃত হয়। সৎসঙ্গের সদর দপ্তর ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে তাদেরও শতবর্ষ পালিত হচ্ছে। সেবা, মূল্যবোধ ও উন্নয়নের নানা কর্মধারায় তাদের আধ্যাত্মিক অভিযান এগিয়ে চলেছে।

ভগবান বিরসা মুণ্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী আগামী ১৫ নভেম্বর শুরু হবে। এই সার্ধশতবর্ষ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কীভাবে ভগবান বিরসা মুণ্ডা জনজাতি বন্ধুদের দাসত্ব ও শোষণ থেকে, বৈদেশিক আধিপত্য থেকে মুক্তি, নিজেদের অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয় রক্ষা এবং স্বধর্ম রক্ষার জন্য বিদ্রোহ বা উলগুলানের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন। ভগবান বিরসা মুণ্ডার গৌরবময় আত্মত্যাগের কারণে আমাদের জনজাতি

ফঃ ৫

ভাই-বোনেদের আত্মসম্মান, উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনের মূলধারায় যুক্ত হওয়ার ভিত গড়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্র

দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের জন্য যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের আমরা এজন্যই স্মরণ করি, তাঁরা তো আমাদের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেনই, উপরন্তু নিজের জীবন উৎসর্গ করে এমন উদাহরণ স্থাপন করেছেন যা আমাদের জীবন ও আচরণ নির্মাণের সহায়ক। নিরাসক্তি, নিঃস্বার্থপরতা ও নির্ভীকতা ছিল তাঁদের জীবনের বৈশিষ্ট্য। যখনই সংগ্রামের আহ্বান এসেছে, তখনই তাঁরা পূর্ণশক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা কখনোই কারও প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতার ভাব পোষণ করতেন না। সদাচার ও অহংকারহীনতা ছিল তাঁদের জীবনের বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সময়ে আমাদের এই ধরনের জীবনযাপন ও আচরণ বাঞ্ছনীয়। পরিস্থিতি অনুকূল বা প্রতিকূল হোক, ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্রের এরূপ শক্তিই সমৃদ্ধি ও লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

দেশের অগ্রগতি

বর্তমান যুগ মানবজাতির কাছে দ্রুততার সঙ্গে বৈষয়িক উন্নতির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা আমাদের জীবনকে করে তুলেছি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। কিন্তু অন্যদিকে আমাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত আমাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে হামাস ও ইজরায়েলের যুদ্ধ কতদূর বিস্তার লাভ করবে তা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। আমাদের দেশেও উজ্জ্বল সম্ভাবনার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা রয়েছে। রীতি অনুযায়ী সঙ্ঘের বিজয়াদশমীর বক্তব্যে এই দুটি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। তবে আজ আমি শুধু কয়েকটি চ্যালেঞ্জের বিষয়ে আলোচনা করব। কেননা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে আমাদের দেশ যে গতি পেয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। সকলেই অনুভব করছেন, বিগত বছরগুলিতে একটি জাতি হিসেবে ভারত বিশ্বের শক্তিশালী ও মর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বিশ্বে ভারতের সুখ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বহুক্ষেত্রে ভারতের ঐতিহ্য ও দর্শনের প্রতি বিশ্বের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র বিশ্ব আজ আমাদের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, পরিবেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের যোগ ইত্যাদি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছে। সমাজে বিশেষ করে যুবপ্রজন্মের মধ্যে স্বাভিমানবোধ বাড়ছে। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। জম্মু-কাশ্মীর-সহ সবকটি নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমার বিশ্বাস দেশের যুবশক্তি, মাতৃশক্তি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক, প্রশাসন ও সরকার সকলেই তাদের লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর থাকবে। বিগত বছরগুলিতে জাতীয় সুরক্ষায় তাদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি, শক্তি, খ্যাতি ও স্থান ক্রমাগত উন্নত হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও কিছু অদৃশ্য ষড়যন্ত্র আমাদের সকলকে এক ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করে তুলেছে। এই পরিস্থিতি সঠিকভাবে বোঝা দরকার। আমরা যদি দেশের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। দেখা যাচ্ছে, দেশের চারদিককে অশান্ত ও অস্থির করার প্রচেষ্টা গতি লাভ করছে।

দেশবিরোধী অপচেষ্টা

বিশ্বে ভারতের অগ্রগতির কারণে তাদের প্রাধান্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এই ধরনের স্বার্থান্বেষী শক্তি ভারতের অগ্রগতিকে একটি সীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে চায়। যেসব দেশ নিজেদের উদার, গণতান্ত্রিক এবং বিশ্বশান্তির জন্য দায়বদ্ধ বলে দাবি করে, তাদের সেই দাবি তাদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের প্রশ্ন উঠলেই উধাও হয়ে যায়। তখন অবৈধ ও হিংসাত্মকভাবে অন্য দেশগুলিকে আক্রমণ করতে অথবা গণতান্ত্রিকভাবে তাদের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করতে তাদের বাধে না। ভারতের অভ্যন্তরে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখলে এই বিষয়গুলি সহজেই অনুধাবন করা যায়। এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা অর্ধসত্যের ভিত্তিতে ভারতের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে কেউ অন্য দেশকে সাহায্য করে না। ভারত একমাত্র দেশ যারা নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বিপন্ন বন্ধু বা প্রতিবেশীকে সাহায্য করে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি সংঘটিত জঙ্গি অভ্যুত্থানের তাৎক্ষণিক ও স্থানীয় কারণগুলি সেই ধরনের অপচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়। সেখানে হিন্দু সমাজের ওপর অহেতুক নৃশংস অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি হয়। সেসব নৃশংসতার প্রতিবাদে সেখানকার হিন্দু সমাজ এবার সংগঠিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তাই কিছুটা হলেও রক্ষা পায়। কিন্তু যতদিন এই অত্যাচারী মোল্লাবাদী শক্তি থাকবে ততদিন সেখানকার হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু মানুষের মাথায় বিপদের খাঁড়া ঝুলতে থাকবে। উদারতা, মানবতা ও সদিচ্ছা সমর্থনকারী সকল পক্ষের,বিশেষ করে ভারত সরকার এবং সারা বিশ্বের হিন্দুদের সক্রিয় সহায়তা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়া হিন্দুদের অতি প্রয়োজন। অসংগঠিত ও দুর্বল থাকা মানেই দুষ্টদের নৃশংসতাকে আমন্ত্রণ জানানো— এই শিক্ষা সারা বিশ্বের হিন্দুদের গ্রহণ করা উচিত।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থেমে নেই, বাংলাদেশে এখন চর্চা চলছে, ভারতের সঙ্গে মিত্রতা তাদের পক্ষে বিপদের, পাকিস্তানই তাদের প্রকৃত মিত্র। এই ধরনের আলোচনা চালানো এবং তার প্রচার করে কোন কোন দেশ ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব প্রশাসনিকভাবে মোকাবিলা করার বিষয়। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, সমাজে বিদ্যমান সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিকে ধ্বংস করে, বৈচিত্র্যকে বিচ্ছিন্নতায় রূপান্তরিত করে এবং বিবিধ সমস্যায় রয়েছে এমন জাতিগাষ্ঠীগুলির মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে দেশকে নৈরাজ্যে দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। 'ডিপ স্টেট', 'উওকিজম্', 'কালচারাল মার্কস্‌বাদ' এই ধরনের শব্দগুলো এখন বহু আলোচিত বিষয়। এরা শুধু ভারত নয়, সমস্ত দেশের পরম্পরা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ঘোষিত শত্রু। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং যা কিছু মহৎ বা শুভ বলে বিবেচিত , তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা এইসব গোষ্ঠীর কার্যপ্রণালীর অঙ্গ। যে ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠা সমাজের বৌদ্ধিক ভিত্তি তৈরি করে, যেমন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, বৌদ্ধিক জগৎ এই সবকে তাদের কবজায় নিয়ে আসা এবং সেসবের মাধ্যমে সমাজের চিন্তাচেতনা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করা এই পদ্ধতির প্রথম ধাপ। তারা এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করে যাতে আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে শুরু করি। একত্রে বসবাসকারী সমাজে কোনো একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট চাহিদার ভিত্তিতে তাদের উসকানি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কাজের প্রবণতা তৈরি করা হয়। অসন্তোষ সৃষ্টির মাধ্যমে সেই জনগোষ্ঠীকে সমাজের বাকি অংশ থেকে আলাদা হতে এবং প্রচলিত

ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হতে উসকানি দেওয়া হয়। সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে এমন ফাঁকফোঁকর খুঁজে বের করে সরাসরি সংঘাত তৈরির চেষ্টা করা হয়। সরকারি ব্যবস্থা, আইন, শাসন, প্রশাসন ইত্যাদির প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ তীব্রতর করে নৈরাজ্য ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এভাবে দেশের ওপর বিজাতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। ভারতের বিরুদ্ধে এটা একধরনের গভীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র।

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা দখলের জন্য প্রতিযোগিতায় নামে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সংহতি ও দেশের অখণ্ডতার চেয়ে যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অথবা সমাজের কল্যাণ, জাতির সম্মান ও ঐক্যকে গৌণ মনে করা হয়, তখন সেই অবস্থার সুযোগে ষড়যন্ত্রকারীরা বিকল্প রাজনীতির মোড়কে কোনো একটি দলের সমর্থনে দাঁড়িয়ে নিজেদের ধ্বংসাত্মক গোপন কর্মসূচিকে কৌশলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নিজেরা সামনে না এসে ভারত বিরোধিতাকে সক্রিয় রাখাই এদের কৌশল। এটি কোনো কাল্পনিক গল্প নয়, বিশ্বের বহু দেশেই ঘটেছে। পশ্চিম বিশ্বের বহুদেশে এধরনের চক্রান্তের ফলে মানব জীবনের স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সমৃদ্ধি যেভাবে সংকটে পড়েছে তা স্পষ্টত দৃশ্যমান। আমরা সারা ভারতে এই ধরনের অপচেষ্টা দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে সীমান্ত ও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়।

ভারতের জাতীয় জীবন বা ভারতীয় জনজীবন সাংস্কৃতিক ঐক্য ও উন্নত সভ্যতার মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সামাজিক জীবন মহান মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পুষ্ট। জাতীয় জীবনের ক্ষতি বা ধ্বংস করার এধরনের অপচেষ্টা সময় থাকতেই বন্ধ করা প্রয়োজন। এজন্য সচেতন নাগরিক সমাজকেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনদর্শন এবং সংবিধান প্রদত্ত পথের ওপর ভিত্তি করে একটি গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দূষণ ছড়ানো এইসব ষড়যন্ত্র থেকে সমাজকে সুরক্ষিত করা এখন সময়ের দাবি। মানুষকে বোঝাতে হবে, সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই আমরা অনেক কিছু করতে পারি।

সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রভাব

ভারতের বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে বিকৃত প্রচার ও অবমূল্যায়ন এদেশের নতুন প্রজন্মের চিন্তা, ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। এখন প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সঙ্গে শিশু ও নাবালকদের হাতেও মোবাইল ফোন পৌঁছে গেছে। তাতে কী দেখানো হচ্ছে বা শিশুরা কী দেখছে তার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আমাদের বাড়িতে, পরিবারে ও সমাজে বিজ্ঞাপন এবং বিকৃত দৃশ্য-শ্রাব্য সামগ্রীর ওপর অতি শীঘ্র আইনি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যে মাদকাসক্তি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে তা সমাজকে ভেতর থেকে ফোঁপরা করে দিচ্ছে। মাদকের প্রভাব কখনো বাইরে থেকে বোঝা যায়, কখনো যায় না। পরিবার, সমাজ ও সামাজিক মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে নতুন করে তুলে ধরতে হবে।

আমাদের দেশে যেখানে নারীজাতি 'মাতৃবৎ পরদারেষু' হিসেবে পরিগণিত হয়, যা আমাদের সংস্কৃতি, সেখানে কোথাও কোথাও নারীজাতির ওপর বলাৎকারের ঘটনাও ঘটছে। সম্প্রতি কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে যা ঘটেছে তা সমগ্র দেশকে কলঙ্কিত করেছে। এর প্রতিবাদে এবং দ্রুত বিচারের দাবিতে সমস্ত দেশ চিকিৎসক ভাই-বোনেদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে এধরনের ঘটনা ঘটতেই না পারে। কিন্তু এমন জঘন্য অপরাধ ঘটার পরও অপরাধীদের বাঁচানোর জন্য কিছু লোকের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাই প্রমাণ করে যে অপরাধ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিহীনতার অশুভ আঁতাত কীভাবে আমাদের দেশের মর্যাদা নষ্ট করছে।

ক্ষমতার গুরুত্ব

আজ ভারতের প্রায় সর্বত্র মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটিয়ে এবং বৈষম্যমূলক আচরণ সৃষ্টির মাধ্যমে বিভেদকামী শক্তি সমাজ ভাঙার খেলায় মেতেছে। জাতি, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদি ছোটো ছোটো বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে সংঘাত সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এটা এমনভাবে করা হচ্ছে যে, ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং পরিচয়কেন্দ্রিক আন্দোলন যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বগ্রাসী সংকট হয়ে না উঠছে , ততক্ষণ বাকি সমাজ জানতেই পারছে না। এই কারণেই আজ দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ, উপকূলবর্তী রাজ্য কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্যদিকে বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল অশান্ত। আগে যে পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে তা এইসব রাজ্যেও বিদ্যমান।

দেশে কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে কট্টরবাদকে উসকানি দেওয়ার ঘটনাও বাড়ছে। পরিস্থিতি বা নীতির প্রতি অসন্তোষ থাকতে পারে, তবে তা প্রকাশ করার এবং তার বিরোধিতা করার গণতান্ত্রিক উপায় রয়েছে। সেসব উপায় অনুসরণ না করে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়া, সমাজের এক বা নির্দিষ্ট অংশকে আক্রমণ করা, কোনো কারণ ছাড়াই হিংসা সৃষ্টি করা, ভয়ের পরিবেশ নির্মাণ করা— এসব গুন্ডাগিরিরই নামান্তর। ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর আমাদের সচেতন করে এই ধরনের আচরণকে 'অরাজকতার ব্যাকরণ' (গ্রামার অব অ্যানার্কি) বলে অভিহিত করেছেন। এবারে গণেশপূজায় গণেশ বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বিনা প্ররোচনায় পাথর ছোঁড়ার ঘটনা এবং পরবর্তী উত্তেজনার পরিস্থিতি এধরনের অরাজকতার উদাহরণ। এধরনের ঘটনা ঘটতে না দেওয়া, ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা এবং দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে আইনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া প্রশাসনের কাজ। কিন্তু প্রশাসন না পৌঁছানো পর্যন্ত সমাজকেই নিজেদের এবং প্রিয়জনদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে। সমস্ত ধরনের গুন্ডামি প্রতিহত করতে হবে। এরজন্য সমাজকে সর্বদা জাগ্রত ও সক্রিয় থাকতে হবে এবং এসব কুপ্রবৃত্তি এবং তাদের মদতদাতাদের চিহ্নিত করতে হবে।

এই সমস্ত পরিস্থিতির বর্ণনা ভীতি সঞ্চার করার জন্য অথবা কারও বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবার জন্য নয়। আমরা সবাই অনুভব করছি যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই দেশকে ঐক্যবদ্ধ, সুখী, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা সকলের ইচ্ছা ও কর্তব্য। একাজে হিন্দু সমাজের দায়িত্ব বেশি। স্থিতিশীল সমাজ নির্মাণ, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সম্মিলিত চেষ্টা প্রয়োজন। যখন সমাজ নিজেই জাগ্রত হয়, নিজের প্রচেষ্টায় তার ভাগ্য নির্ধারণ করে, তখন মহামানবদের পথনির্দেশ, বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন সবার সহায়তা পাওয়া যায়। সমাজ শক্তিশালী থাকলে সব উপদ্রব আপনা থেকেই চলে যায়। দেবতারাও দুর্বলকে সাহায্যের কথা ভাবেন না। একটি সুভাষিতমে বলা হয়েছে,

অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্র্যাঘ্রং নৈব চ নৈব চ।
অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ দেবো দুর্বল ঘাতকঃ।।

হাতি, ঘোড়া, সিংহকে কেউ বলি দেয় না। বলি দেয় দুর্বল ছাগলকে। সেজন্য সমাজকে সবল হতে হবে, তবেই দুষ্ট দমনের কাজ সহজ হবে। সে কারণেই সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর এরকম কিছু বিষয় নিয়ে সমাজের সজ্জনশক্তিকে সক্রিয় করার কথা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ভেবেছেন।

সম্প্রীতি ও সম্ভাবনা

সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলার প্রথম শর্ত হলো সামাজিক সম্প্রীতি এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া। শুধু কিছু প্রতীকী কর্মসূচি পালন করলেই এই কাজ সম্পন্ন হয় না। সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তি ও পারিবারের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকতে হবে। আমাদের সবাইকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে এবিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। একে অপরের উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে। কোনো একটি গোষ্ঠীর মানুষের উৎসব সমগ্র সমাজের উৎসবে পরিণত করতে হবে। বাল্মীকি জয়ন্তী কিংবা রবিদাস জয়ন্তী কেন সমাজের সকলের উৎসব হয়ে উঠবে না? মন্দির, জলাশয়, শ্মশান ইত্যাদির মতো সর্বসাধারণের ব্যবহার এবং শ্রদ্ধার স্থানগুলিতে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রবেশাধিকার থাকা উচিত। পরিস্থিতির কারণে উদ্ভূত সমাজের নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর অভাব অভিযোগ সমগ্র সমাজের উপলব্ধি করা উচিত। পরিবারে যেমন একজন সক্ষম সদস্য পরিবারের দুর্বল ব্যক্তির জন্য আরও বেশি সহযোগিতা করে, কখনো কখনো নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও অন্যকে সাহায্য করে থাকে, তেমনই আপনত্ববোধের কথা মাথায় রেখে এই ধরনের অভাব অভিযোগ, প্রয়োজনগুলি বিবেচনা করা উচিত।

সমাজের অনেক বর্ণ বা গোষ্ঠীকে পরিচালনা করার জন্য নিজস্ব সামাজিক সংগঠন রয়েছে। এইসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ গোষ্ঠীর উন্নতি, প্রগতি, সংস্কার ও সার্বিক কল্যাণের কথা ভাবেন। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ যদি একত্রে বসে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করেন তাহলে সমাজের সর্বত্র সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের পরিবেশ তৈরি হবে। এরফলে সমাজকে বিভক্ত করার কোনো দুষ্টচক্র সফল হবে না। এজন্য প্রথমত আমাদের কার্যক্ষেত্রের মধ্যে দেশের স্বার্থে, সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য আমরা বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়ে কী কী কাজ করতে পারি এবং কী পরিকল্পনা করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। দ্বিতীয়ত, আমাদের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কল্যাণে সবাই মিলে কী করতে পারি। এ ধরনের ভাবনা ও কাজ নিয়মিত চলতে থাকলে সমাজ সুস্থ হয়ে উঠবে এবং সম্ভাবনার পরিবেশও তৈরি হবে।

পরিবেশ রক্ষা

পরিবেশ দূষণ এখন একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। বর্তমানে ভারতেও পরিবেশের ভারসাম্যে অবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঋতুচক্র অনিয়মিত ও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সৃষ্টি থাকবে কিনা এটাই এখন আলোচনার বিষয়। ভোগবাদ ও বস্তুবাদের অপরিণামদর্শী তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত উন্নয়ন যাত্রা আজ মানুষ-সহ সমস্ত জীবজগতের ধ্বংসযাত্রায় পরিণত হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী সম্পূর্ণ, সামগ্রিক ও সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা তা করিনি। বর্তমানে এই ধরনের চিন্তাভাবনা কিছুটা শোনা যাচ্ছে, উপর উপর কিছু বিষয় গ্রহণ করা হয়েছে, সামান্য কিছু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বেশি কাজ হয়নি। উন্নয়নের নামে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়া এবং তথাকথিত উন্নয়নের অপরিণামদর্শী পথকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার কুফল আমরাও ভোগ করছি। গ্রীষ্মঋতু ঝলসে দিচ্ছে, বৃষ্টি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রবল শীত জীবনকে হিমশীতল করে দিচ্ছে। ঋতুর এই বিক্ষিপ্ত প্রখরতা আমরা অনুভব করছি। নির্বিচারে বনজঙ্গল কাটার ফলে সবুজ বিনষ্ট হচ্ছে, নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, রাসায়নিক দ্রব্য আমাদের খাদ্যশস্য, জল, বায়ু ও মাটিকে বিষাক্ত করে তুলেছে, পাহাড়ে ভূস্খলন হচ্ছে, মাটি ফেটে যাচ্ছে। তাই আমাদের নিজস্ব চিন্তনের ভিত্তিতে উন্নয়নের পথ নির্মাণ করতে হবে এবং সেইমতো নীতি তৈরি করতে হবে, এ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এটা তখনই সম্ভব যখন সমগ্র দেশে একই ধরনের পরিবেশ ভাবনা গড়ে উঠবে এবং দেশের বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিকেন্দ্রিতভাবে করতে হবে।

আমরা এই কাজ নিজের বাড়ি থেকে শুরু করতে পারি তিনটি ছোটো ছোটো কাজের মাধ্যমে— প্রথম, জল সংরক্ষণ, দ্বিতীয়, প্লাস্টিক ব্যবহার না করা, বিশেষ করে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক সম্পূর্ণ বর্জন করা। তৃতীয় কাজ বৃক্ষরোপণ। নিজের বাড়ি থেকে শুরু করে আশেপাশে সর্বত্র গাছ লাগানো, আর তা যেন আমাদের দেশের পরম্পরাগত তথা পরিবেশের উপযোগী গাছ হয়।

সংস্কার জাগরণ

সংস্কার আসে শিক্ষা থেকে আর শিক্ষা তিনটি স্থান থেকে পাওয়া যায়। প্রথম পরিবার থেকে। বাড়ির পরিবেশ ও সকলের আচরণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের শিক্ষালাভ হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া একটি সংস্কৃত সুভাষিতমে---

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ।।

নারীজাতিকে মাতৃজ্ঞানে দেখা, অন্যের জিনিসকে মাটির ঢেলা জ্ঞান করা, পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করা, এমন আচরণ না করা যা অন্যের কষ্টের কারণ হয়। এই শিক্ষা সর্বপ্রথম বাড়ি থেকেই আর ছোটোবেলাতেই হয়। নতুন শিক্ষানীতিতে এই ধরনের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা এবং সেই অনুযায়ী পাঠ্যক্রম রচনার চেষ্টা করা হলেও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষকের উদাহরণ তৈরি না হলে তা ফলপ্রসূ হবে না। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণের নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ৩-১২ বছরে শিশুর নিজের পরিবারে পাওয়া শিক্ষা থেকে মনোভূমিকা গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়, সামাজিক পরিবেশ। সমাজ বড়ো বা মহান ব্যক্তিদের আচার-আচরণকে অনুসরণ করে। সেইসব ব্যক্তিরও সংস্কারের বিষয়গুলি ভাবনার মধ্যে রাখা উচিত এবং তাদের প্রভাবে সমাজে পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এধরনের মূল্যবোধ প্রসারে সচেষ্ট হওয়া উচিত। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী সকলকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে এই মাধ্যম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই মাধ্যম এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সমাজ ভেঙে না যায় আর সংস্কৃতিহীনতাও যেন না ছড়িয়ে পড়ে।

শিক্ষার সূচনা এবং আচরণের ভিত্তি তিন থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে বাড়িতেই তৈরি হয়। বাড়ির বড়োদের আচার আচরণ, বাড়ির পরিবেশ এবং পরিবারের সদস্যদের কথোপকথনের মাধ্যমে এই শিক্ষা সম্পন্ন হয়। আত্মমর্যাদা, দেশপ্রেম, নৈতিকতা, কর্তব্যবোধ ইত্যাদির মতো

গুণাবলী এই সময়ে গড়ে ওঠে। এটা মাথায় রেখে নিজেদের পরিবার থেকেই এই কাজ শুরু করতে হবে।

নাগরিক অনুশাসন

সমাজজীবনে সংস্কারের প্রকটীকরণ যখন হয় তার আরেকটি দিক হলো আমাদের সামূহিক বা সামাজিক জীবন বা নাগরিক জীবন। সবার সঙ্গে চলার কিছু নিয়ম রয়েছে। দেশকাল পরিস্থিতি অনুযায়ী তা পরিবর্তনশীল। নিয়মের যথাযথ পালনই হলো নাগরিক অনুশাসন। শ্রদ্ধা সহকারে, তার আক্ষরিক অর্থ ও ভাব বুঝে এই সব নিয়ম পালন করা উচিত । দেশের আইন ও সংবিধান একটি সামাজিক অনুশাসন। সংবিধানের প্রস্তাবনাতে প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে 'আমরা ভারতের জনগণ।' নিজেরাই আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।। সংবিধানের চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে— প্রস্তাবনা, নির্দেশমূলক নীতি , মৌলিক কর্তব্য ও মৌলিক অধিকার। এই বিষয় সকলকে জানতে হবে। পরিবার থেকে অর্জিত পারস্পরিক আচরণের অনুশাসন, পারস্পরিক ব্যবহারে মাঙ্গলিকতা, পারস্পরিক আচরণে সৌহার্দ্য, শালীনতা এবং একইসঙ্গে সামাজিক আচরণে দেশভক্তি ও সমাজের প্রতি আত্মীয়তার সঙ্গে আইন ও সংবিধানের যথাযথ পালন। এইসব নিয়ে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র গড়ে ওঠে। দেশের নিরাপত্তা, ঐক্য, অখণ্ডতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করত হলে মানব চরিত্রের এই দু'টি দিক ত্রুটিমুক্ত ও পরিপূর্ণ হওয়া অতি প্রয়োজন। এই বিষয়ে আমাদের সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে।

স্ব গৌরব

এই আচরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকার জন্য চাই 'স্ব'-এর প্রেরণা। আমরা স্বদেশির কথা বলি কিন্তু 'স্ব' কী? আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে? এই প্রশ্নের ভিত্তিতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, সেই সত্যের উপর ভিত্তি করে মূল্যবোধ নির্মিত হয়, যাকে আমরা ধর্ম বলি। সত্য, করুণা, শুচিতা ও তপস্যা এই চারটির উপর যা স্থাপিত তাই ধর্ম। ধর্ম ভারতের স্ব; রিলিজিয়ন নয়। ধর্মই ভারতের প্রাণ এবং সেটিই আমাদের প্রেরণা। তার জন্যই আমাদের এই ইতিহাস নির্মিত হয়েছে, তার জন্যই আমাদের এত বলিদান হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ভারতবর্ষের যে কর্তৃত্ব, তা ধর্মের কারণে হয়েছে। সেই ধর্ম যা শাশ্বত, সনাতন, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্ব লাভ করেছে, যা সকলের কাছে এবং সকলের জন্যই রয়েছে। আমরা তা খুঁজিওনি, কাউকে দিইওনি, কেবল চিনেছি, সেই জন্য হিন্দুধর্ম মানব ধর্ম, বিশ্বধর্ম। তা আমাদের স্ব। তার উপর ভিত্তি করে চলা, ছোটো-ছোটো আচরণও সেই অনুযায়ী করা। তার দ্বারা যে গৌরব উৎপন্ন হয় তাকে স্বাভিমান বলে। তাই দেশেই যা তৈরি হয় তা বাইরে থেকে না এনে দেশের কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। বাইরে থেকে সেটাই আনতে হবে যা দেশে তৈরি হয় না। দেশে যা তৈরি হয় তা বাইরে থেকে আনা উচিত নয়। যে সব জিনিস দেশে তৈরি হয় না তা ছাড়াই কাজ চালানোর অভ্যাস করতে হবে। এমন কিছু জিনিস থাকে যা ছাড়া কোনোভাবেই চলে না শুধুমাত্র সেই জিনিসই বাইরে থেকে কেনা যেতে পারে। বাড়িতে আমাদের ভাষা, ভূষা (পোশাক), ভজন, ভোজন যেন পরম্পরাগত হয়। ভ্রমণও দেশের ধর্ম-ইতিহাস সংস্কৃতিকে জানার জন্য করা, ভবনও যেন ভারতীয় পরম্পরাযুক্ত হয়। একেই স্বদেশী আচরণ বলে। এছাড়াও সমরসতা, সদ্ভাবনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, কুটুম্ব প্রবোধন, স্বদেশী ও নাগরিক অনুশাসনের মতো বিষয় নিয়ে স্বয়ংসেবকেরা সমাজের সজ্জনশক্তির কাছে যাচ্ছেন।

মন, বচন ও কর্মের বিবেক

জাতীয় চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মন, বচন ও কর্মের সমন্বয়। আমাদের দেশ বিবিধতায় ভরা, বিবিধ স্থিতিতে লোক রয়েছে। এই বিবিধতা বিচ্ছিন্নতা নয়, সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য মাত্র। তাই এই নিয়ে সংঘর্ষ, আইন অমান্য, কেউ কিছু করলে সমগ্র শ্রেণীকে দায়ী করা, এটা কখনও সমাধানের পথ হতে পারে না। বরং সহিষ্ণুতা, সদ্ভাবনাই হলো ভারতের পরম্পরা। ক্ষোভ থাকলেও সংযম রাখা। মন, বচন ও কর্মের দ্বারা কখনও কোনো ব্যক্তি, পন্থ, উপাসনা, গ্রন্থ ইত্যাদির অপমান না হয় সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যের দ্বারা ঘটে গেলেও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। সমাজের একাত্মতা ও সদ্ভাবনা যে কোনো সময়কালে, যে কোনো দেশের জন্য চরম সত্য এবং মানুষের সুখী থাকা ও সামূহিক জীবনের একমাত্র উপায়।

এই সব কিছুর জন্য শক্তি চাই। পৃথিবীতে দুর্বলের কোনো স্থান নেই। ভারতের যখন শক্তি কম ছিল তখন প্রতি পদে পদে অপমান হতে হতো। এখন ভারতের সম্মান অনেক বেড়ে গেছে। ভারত যত বড়ো হবে, ততই তার কথা স্বীকার্য হবে। ভারতের কথা সত্য, সদ্ভাবনাপূর্ণ, কিন্তু শক্তি থাকলেই তা মান্য হবে। সেই জন্য শক্তির সাধনা করতে হবে। শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক সবধরনের শক্তি চাই, সংগঠিত সমাজের শক্তি চাই। তারই সাধনা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ করে চলেছে। শক্তির সঙ্গে দৃষ্টির প্রয়োজন, তাই সঙ্ঘে বলের সঙ্গে শীলের (চরিত্রের) সাধনা হয়। চরিত্রসম্পন্ন শক্তি জগতে সদ্ভাবনা ও শান্তির ভিত্তি। 'সাধনাই মুক্তির শুভদ্বার, শক্তিই শান্তির আধার'। কিন্তু সেই শক্তি চরিত্রসম্পন্ন হতে হবে। তাই সঙ্ঘের প্রার্থনাতে বলা হয়েছে— 'অজয়্যাং চ বিশ্বস্য দেহীশ শক্তিম্' অজেয় শক্তি, যাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না এবং তার সঙ্গেই বলা হয়েছে 'সুশীলং জগদ্ যেন নম্রং ভবেৎ' অর্থাৎ এমন চরিত্র যার সামনে সমস্ত জগৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে নত হয়। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে যে সম্পূর্ণ বিশ্বের ব্যবস্থা, শুভ চেতনাকে নষ্ট করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য বাধা উৎপন্ন করবে তাকে অতিক্রম করে নির্ভয় হয়ে অগ্রসর হতে হবে। দেবতারা তাদের শক্তি সংবদ্ধ করে ন'রাত্রি জাগরণ করায় দেবী জগদম্বা প্রকটিত হন। অশুভশক্তি বিনষ্ট হয়ে শুভশক্তির জয় হয় এবং বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হয়। এই বিশ্বকল্যাণের সাধনায় মৌন পূজারির মতো স্বয়ংসেবকরা কাজ করে চলেছেন। এই সাধনা সকলকেই পবিত্র মাতৃভূমিকে পরম বৈভবসম্পন্ন করার শক্তি ও সফলতা প্রদান করবে। এই সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশও এমন সাধনা তাদের দেশের প্রতি করবে আর প্রত্যেক দেশ সমর্থশালী হয়ে বিশ্বের কল্যাণে যোগদান করবে। এই বিশেষ পরিস্থিতি এই পথেই আসবে। এই সাধনা সুখ-শান্তি-সদ্ভাবনাযুক্ত বিশ্ব নির্মাণের।

হিন্দুভূমির অঙ্গ হয়ে জাগুক শক্তির অবতার,
জল স্থল আকাশে উঠুক হিন্দুর জয় জয়কার।
জগজ্জননীর জয় জয়কার।
।। ভারতমাতা কী জয়।।

(নাগপুরে বিজয়াদশমী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ)

পুরোহিত ও তিন ধূর্ত

এক নগরে মিত্রশর্মা নামে এক পুরোহিত বাস করত। পূজা-পার্বণ আর শাস্ত্রচর্চা নিয়ে সে সবসময় ব্যস্ত থাকত।

মাঘমাস। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। অনেক দূর গ্রামের এক যজমানের বাড়ি থেকে ডাক এসেছে। যজমানটি ছিল খুব

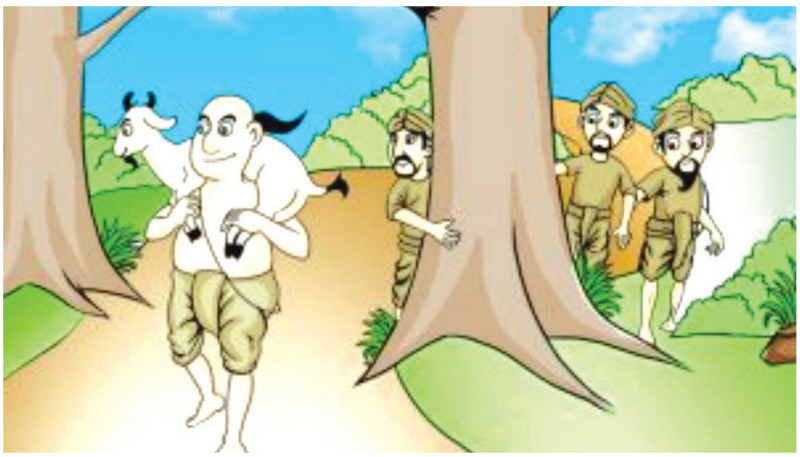

বড়োলোক। পূজাআর্চার পর পুরোহিতকে মোটা টাকা দক্ষিণার সঙ্গে একটা নাদুসনুদুস পাঁঠা দিল। মিত্রশর্মা খুশি হয়ে যজমানকে আশীর্বাদ করে বাড়ির পথ ধরল।

পাঁঠাটি ছিল খুব দুরন্ত। কেবলই ছটফট করছে। পুরোহিত সেটাকে কাঁধে তুলে নিল।

দূরে বসে তিন ধূর্ত কাউকে ঠকানো কথা ভাবছিল। তাদের নাম খুল্লক, চনক ও তিলক। হঠাৎ তাদের চোখ পড়ে পাঁঠা কাঁধে পুরোহিতের ওপর। দূর থেকে পুরোহিতকে আসতে দেখে তিন ধূর্ত মহা খুশি। শীতের দিনে ওই কচি পাঁঠার মাংসের ঝোল দিয়ে ভোজটা দারুণ হবে। তিনজনে মিলে ঠিক করল কে কীভাবে কথা বলে পুরোহিতকে ঠকাবে।

পাঁঠা কাঁধে পুরোহিত বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। কোনো দিকে তার নজর নেই। পাঁঠা পেয়ে তার মনটা বেজায় খুশি। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল খুল্লক। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই। কিন্তু এটা কাঁধে কী নিয়ে যাচ্ছেন? একটা কুকুর! লোকে তো আপনাকে ছ্যা ছ্যা করবে।

হঠাৎ এরকম কথা শুনে পুরোহিত একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর নিজেকে সামালে নিয়ে বলল, চোখের কি মাথা খেয়েছ? দেখতে পাচ্ছ না এটা একটা পাঁঠা? বাড়িতে যজ্ঞ হবে তাই যজমানের বাড়ি থেকে দিয়েছে। খুল্লক জিভ কেটে বলল, ভুল হয়েছে ঠাকুরমশাই, মাফ করে দেবেন। পুরোহিত রাগে গরগর করতে করতে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

কিছুটা পথ যেতেই সামনে এসে দাঁড়াল দ্বিতীয় ধূর্ত চনক। সে পুরোহিতকে গড় হয়ে প্রণাম করল। তারপর ভালো করে তাকিয়ে অবাক হওয়ার ভান করে পুরেহিতকে বলল, ঠাকুরমশাই আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে, একটা কুকুরকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন? না না, এ কাজটা মোটেই ভালো করেননি। লোকে যে নিন্দে করবে।

পুরোহিতের মেজাজ গেল বিগড়ে। বলল, তুমিও অন্ধ নাকি? আস্ত একটা পাঁঠাকে কুকুর বলছ? পথ ছাড়ো, যেতে দাও আমায়। সেখানে আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে পুরোহিত হন হন করে এগিয়ে চলল। তবে মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল, এটা পাঁঠা না কুকুর? মনের সন্দেহ দূর করার জন্য পাঁঠাটিকে ঘাড় থেকে নামিয়ে ভালো করে দেখে নিল। না, পাঁঠা, কুকুর নয়। কিন্তু মনে তার সংশয় সৃষ্টি হলো। দুটি লোকই কি চোখে ভুল দেখবে? তা কী করে হয়?

পুরোহিত চলছে আর মনের মধ্যে একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, দুটো লোকই ভুল দেখল কী করে? হঠাৎ তার সামনে তৃতীয় ধূর্ত তিলক হাজির হলো। লোকটা ফ্যাকফ্যাক করে হেসে উঠে বলল, ও ঠাকুরমশাই, আপনি কি আজকাল শাস্তরটাস্তর মানছেন না? পুরুতঠাকুরের ঘাড়ে চড়ে যাচ্ছে কিনা একটা কুকুর? শিগগির ওটা ঘাড় থেকে নামান। লোকে দেখলে আপনার নামে কেচ্ছা গাইবে।

এবার পুরোহিত আঁতকে উঠল। পরপর তিনটি লোক কি একই ভুল দেখবে? না, আর পারা যাচ্ছে না। ধুত্তোর! বলে পুরোহিত পাঁঠাটিকে মাটিতে নামিয়ে দিল। তারপর পাশের পুকুরে নেমে স্নান করে বাড়ির দিকে ছুটল।

তিলক ধূর্ত এই সুযোগের অপেক্ষাতে ছিল। সে হাসতে হাসতে পাঁঠাটিকে পাঁজাকোলা করে কোলে তুলে নিল।

ঝোপের আড়াল থেকে অন্য দুই ধূর্ত সবকিছু লক্ষ্য করছিল। তারা এবার খুশিতে ডগমগ হয়ে ছুটে এল। তারপর আর কী! তিন ধূর্ততে চলল পাঁঠার মাংসের ভোজ।

(সংগৃহীত)

জাতীয় উদ্যান

নেওরা ভ্যালি

নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক কালিম্পং জেলার একটি জাতীয় উদ্যান। ১৯৮৬ সালে এর প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৯৯২ সালে জাতীয় উদ্যান ঘোষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও ভুটান এই ত্রিসীমানায় এটি অবস্থিত। এই উদ্যানটি ৮৮ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এ উদ্যানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নেওরা নদীর নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে। এখানে ত্রিশটির বেশি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায়। তার মধ্যে কস্তুরী হরিণ, মেঘবর্ণ চিতা বাঘ, বন্য কুকুর, চিতা, লাল পাণ্ডা। গোরাল, কালো হরিণ, চিতা বেড়াল, উড়ন্ত কাঠবেড়ালি, বন্য শুয়োর, শ্লথ উল্লেখযোগ্য। বহু প্রজাতির সরীসৃপ ও পতঙ্গ রয়েছে। একশোর বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৩৮

ঘটিদর্শনেন সময় জ্ঞানম (ঘড়ি দেখে সময়জ্ঞান-১)

ক: সময় ? (কটা বাজে?)

5.00 পঞ্চবাদনম্ (পাঁচটা বাজে)

6.00 ষটবাদনম্ (ছটা বাজে)

7.00 , 8.00, 9.00, 10.00, 11.00

12.00 **দ্বাদশবাদনম্**।

সার্ধ-সাড়ে

ক: সময় ?

5.30 সার্ধপঞ্চবাদনম্ (সাড়ে পাঁচটা বাজে)

6.30 সার্ধষটবাদনম্।

7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30

12.30 **সার্ধদ্বাদশবাদনম্**। (সাড়ে বারোটা বাজে)

ভালো কথা

সহভোজ

মহালয়া উপলক্ষ্যে আমাদের মধ্যভাগের পথসঞ্চলন ছিল। বীরেশ্বর শাখা থেকে আমরা ২০ জন অংশগ্রহণ করেছিলাম। ১০ জন বালক, ১০ জন তরুণ। সঞ্চলন শেষে দেবব্রতদা বললেন, যারা পথসঞ্চলনে অংশগ্রহণ করেছি তাদের শনিবার রাতে সহভোজ হবে। নিজেদেরই রান্না করতে হবে। আমার পড়া থাকায় আমি রান্নার সময় থাকতে পারিনি। যখন গেলাম সবাই খেতে বসেছে। খিচুড়ি, পাঁচমিশেলি তরকারি, চাটনি ও পাঁপড়ভাজা। শুনলাম দেবুদা, নীলদা, অঙ্কিতদা ও আকাশ রান্না করেছে। আমিও খেতে বসে গেলাম। খুব সুন্দর রান্না হয়েছে। সবাই মিলে খেয়েও খাবার বেঁচে গেল। দেবুদা বললেন, কাল শাখার পর আবার খাওয়া হবে। পরদিন শাখায় গিয়ে শুনি, কর্নেল কুণালদার জন্মদিন। শাখা শেষে আমরা কুণালদাকে অভিনন্দন জানালাম। তারপর নিবাসে এসে রাতের খিচুড়ির সঙ্গে বেগুনি আর জিলিপি খেলাম। কুণালদা তাঁর সৈনিক জীবনের গল্প বললেন। খুব আনন্দ হলো।

বিষ্ণু ঘোষ, সপ্তম শ্রেণী, টিপি রোড, কল-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) তি তা গি প্র	(১) কু কু কু লী ণ্ড র
(২) ল র ম ক	(২) কা জ চ য়া ও কু

২৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) খণ্ডবিখণ্ড (২) ক্ষতবিক্ষত

২৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) খাইখরচা (২) গাছগাছালি

উত্তরদাতার নাম

(১) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা। (২) সুবাম দত্ত, জোগাই, বীরভূম।
(৩) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দ ঃ ২৪ পরগনা। (৪) প্রীতি হালদার, বৈষ্ণবনগর, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

HAR GHAR SIP
SIP is one of the simplest ways to Invest and Create your Wealth.

Start an SIP
Take The First Step to
FINANCIAL FREEDOM!

Mr Debashis Dirghangi CFP®
AMFI REGISTERED MUTUAL FUND DISTRIBUTORS

DRS INVESTMENT

PMS | MUTUAL FUND | INSURENCE | MEDICLAIM | FD | BOND

Website: https://drsinvestment.com
Email.: drsinvestment@gmail.com

Contact @ 9748978406 / 8240685206

শ্যামপুকুরের মা ভবতারিণী

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে শ্যামপুকুর থানা সংলগ্ন ২/২এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিটস্থ শতাধিক বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত 'ভবতারিণী কালীমন্দির' কলকাতার প্রাচীন দেবালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। একদা এই এলাকাটি 'কম্বুলিটোলা' নামে পরিচিত ছিল। সেজন্য প্রবীণ ব্যক্তিরা ভবতারিণী কালীমন্দিরকে কম্বুলিটোলা কালীবাড়ি নামে অভিহিত করেন। জগজ্জননী মা এখানে ভবতারিণী রূপে বিরাজিতা।

এবার মন্দির প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কাহিনি উল্লেখ করা যাক। বঙ্গে তখন মুর্শিদকুলি খাঁ-র শাসন। তুলসীরাম ঘোষ ছিলেন নবাবের দেওয়ান। তুলসীরামের পৌত্র হরপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন শক্তিসাধক। কলকাতায় বাসকালে হরপ্রসাদ একরাত্রে স্বপ্নাদেশ পান, মা ভবতারিণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার। ভক্তপ্রবর হরপ্রসাদ কালবিলম্ব না করে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে নিজেদের বসতবাড়ির সামনেই মন্দিরের জন্য এক বিঘা জমি কেনেন। শুভদিন দেখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়ে যায়। মন্দির নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। হরপ্রসাদ অবশ্য জীবদ্দশায় মন্দির সম্পূর্ণ হতে দেখে যেতে পারেননি। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের পর, তাঁর সহধর্মিণী দয়াময়ী দাসী মন্দিরের কাজ শেষ করার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দয়াময়ী দাসী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবতী, ধর্মপ্রাণা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না রমণী। মন্দির নির্মাণের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য তিনি তাঁর শ্বশুর ভবানীপ্রসাদ ঘোষের ঢাকা শহরে বুড়িগঙ্গাতীরের বসতবাড়ি এবং সংলগ্ন জমি বিক্রি করে সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করেন। এছাড়া নিজের যাবতীয় অলংকার এবং মূল্যবান আসবাব পত্র বিক্রি করে প্রয়াত স্বামীর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে ব্রতী হন। মা ভবতারিণীর মূল মন্দির এবং তার পাশে দুটি শিবমন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৫ বৈশাখ বাসন্তী পঞ্চমীতে মা ভবতারিণী এবং 'হরপ্রসন্ন' ও 'হরেশ্বর' নামক দুই শিবলিঙ্গ সংবলিত মন্দিরের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। তদবধি বাসন্তী পঞ্চমীর পুণ্যতিথি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়।

ভবতারিণী কালীমাতার মন্দিরের প্রতিষ্ঠার পর ভক্তিমতী ও স্নেহশীলা দয়াময়ী লিখিত অপর্ণনামায় তাঁর একমাত্র পুত্র সারদাপ্রসাদকে সমস্ত সম্পত্তি-সহ ভবতারিণী মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত করে যান। তদবধি সারদাপ্রসাদের উত্তরসূরিরা মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবায়েতের দায়িত্বে রয়েছেন। মন্দিরের ব্যয়ভার নির্বাহ হয় সেবায়েতদের স্বোপার্জিত অর্থে।

ভবতারিণীর মূল মন্দির, সন্নিহিত দু'টি শিবমন্দির ও নাটমন্দির— দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত। দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দির। মা ভবতারিণীর মূর্তি ও শিবলিঙ্গ দুটি কালো কষ্টিপাথরে তৈরি। মন্দিরে শালগ্রাম শিলা, গণেশ, সিংহ ও শেয়ালের মূর্তি আছে। ভবতারিণীর বিগ্রহ ও শিবলিঙ্গ দুটি শিল্পী বাড়িতেই তৈরি করেছিলেন। শোনা যায় মাতৃমূর্তি ও দুটি শিবলিঙ্গ তৈরি করার পরে কিছু কষ্টিপাথর থেকে যায়। সেই বাড়তি কষ্টিপাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল গণেশ, সিংহ এবং শেয়ালের তিনটি মূর্তি। মা ভবতারিণীর পাদদেশে রয়েছেন মহাকাল, তাঁর অবয়ব শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত। এই পাথর আনা হয়েছিল জয়পুর থেকে।

মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই একটা আধ্যাত্মিক পরিণ্ডমলের স্পর্শ পাওয়া যায়। মাধুর্যময় সুখানুভূতি ভক্তকে মোহিত করবে। মাতৃমূর্তির সামনে দাঁড়ালে মায়ের ভুবনভোলানো রূপের আলোয় ভক্তহৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। চোখ হয়ে ওঠে সিক্ত। অপরূপ দক্ষিণাকালী মূর্তি আগে সবস্ত্রা ছিলেন না। বর্তমানে অবশ্য তিনি বস্ত্রপরিহিতা। ঘোমটাপরা স্নেহময়ী জননীবেশে মা ভবতারিণী মন্দির আলো করে ভক্তদের কৃপাবর্ষণ করছেন।

কালীপূজা, রটন্তীকালী পূজা, ফলহারিণী কালীপূজা ও শিবরাত্রিতে মহা সমারোহে পূজা হয় ভবতারিণী মন্দিরে। ভক্তিপ্রাণ নর-নারীর ভিড়ে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। দুর্গাপূজার মহানবমীতে ভবতারিণী কালীমাতা 'দুর্গতিনাশিনী দুর্গা' রূপে পূজিতা হন। মা ভবতারিণীর পায়ে ভক্তির অঞ্জলি নিবেদন করে হৃদয়ে অপার শান্তি অনুভব করে মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীরা। ভবতারিণী মা জাগ্রতা, এ বিশ্বাস বহু মানুষের। আর সেই আকর্ষণে শুধু বাঙ্গলাই নয়, ভারতের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ মা ভবতারিণীর কৃপা লাভের জন্য এই মন্দিরে ছুটে আসেন। □

NPHCE

NATIONAL HEALTH MISSION
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন

বয়স্ক স্বাস্থ্য যত্নের জাতীয় কর্মসূচী

আসুন বয়স্ক ব্যাক্তিদের জীবন সক্রিয় ও স্বাস্থ্যকর করে তুলি
বয়স্ক ব্যাক্তিদের যত্ন আমাদের সাংস্কৃতির একটি ঐতিহ্য

কী করবেন-

- প্রতিদিন কিছু শারীরিক কার্যকলাপ করুন
- নিয়মিত মেডিক্যাল চেক-আপ-এ থাকুন
- স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্য গ্রহন করুন
- নিরামিষ খাবার-এ অভ্যস্থ হোন
- ভালো ভাবে ঘুমোন এবং স্বাস্থ্যকর অনুশীলন মেনে চলুন
- আমোদ প্রমোদ এবং ফুর্তিতে থাকুন
- চিকিৎসকের নির্দেশানুসারে ওষুধ গ্রহন করুন
- অধিক পরিমানে যোগ ব্যায়াম অভ্যাস করুন
- আপনার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং বিশেষ করে পায়ের যত্ন নিন
- সামাজিক কর্মযজ্ঞ-এ অংশ নিন
- সতর্ক এবং সক্রিয় থাকুন
- চলাফেরার সময় লাঠি বা ওয়াকার ব্যবহার করুন

কী করবেন না-

- হালকা ব্যাথা উপেক্ষা করতে পারেন এবং সময়মত চিকিৎসা পরিষেবা নিন
- অলস ভাবে সময় কাটাবেন না
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন করবেন না
- অস্বাস্থ্যকর খাবার বর্জন করুন
- মদ-এ আসক্ত হবেন না
- তামাক এবং ধূমপান বর্জন করুন
- চা ও কফি বেশী পান করবেন না
- পরিবেশের প্রতিকূলতা এড়িয়ে চলুন

বয়স্ক স্বাস্থ্য যত্নের জাতীয় কর্মসূচী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

সত্যমেব জয়তে
ত্রিপুরা সরকার

Choose Life Not Tobacco

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিধি
(Tabacoo Control Law)

NATIONAL HEALTH MISSION
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন

তামাকের কু-প্রভাব ও ক্ষতিকারক দিক

- জন সমাগম স্থান যেমন অডিটরিয়াম, হাসপাতাল চত্বর, রেলওয়ে প্রতীক্ষালয়, বিনোদন কেন্দ্র, রেস্টুরেন্ট, বার, রিফ্রেশমেন্ট কক্ষ, ভোজনালয়, ক্যান্টিন,কফি হাউস, সরাইখানা, এয়ারপোর্ট, প্রতীক্ষালয়, আদালত চত্বর, সরকারি প্রতিষ্ঠান, পাবলিক অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী, যে কোনও কাজের জায়গা, সিনেমা হল, মুক্ত মঞ্চ, অতিথিশালা, ক্লাব চত্বর, পূজা মন্ডপ, রেলওয়ে স্টেশন, জনসাধারনের যানবহন বাসস্টপ এবং যে সকল স্থানে জনসাধারণের যাতায়ত আছে।

উপরোক্ত signage প্রত্যেক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস-এ পাওয়া যাবে। যে সকল দোকানী তামাক জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করেন, তাঁরা যেন অতিসত্বর এই নোটিস/ signage সংগ্রহ করে দোকানে display /প্রদর্শণ করেন, নতুবা আইনানুসারে জরিমানা আদায় করা হবে।

- সমস্তরকম তামাক জাতীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ।
- অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের বালক বা বালিকার কাছে বা তাদের দ্বারা তামাক জাতীয় দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ। নিয়মভঙ্গকারীদের সর্বোচ্চ ২০০ টাকা অব্দি জরিমানা হতে পারে।
- যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাক জাতীয় দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ। নিয়মভঙ্গকারীদের সর্বোচ্চ ২০০ টাকা অব্দি জরিমানা হতে পারে।
- তামাক জাতীয় দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য সতর্কীকরনের বিজ্ঞপ্তি বাধ্যতামূলক।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরা
স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

দেবী কালিকা

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

ভারতীয় সাধনতত্ত্বে দুটি ধারা— পুরুষকেন্দ্রিক ও মাতৃকেন্দ্রিক। বিভিন্ন খনন কার্যে অজস্র মৃন্ময়ী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যা মাতৃ বন্দনার প্রমাণ। সুপ্রাচীনকাল থেকেই মাতৃশক্তি পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পূজিতা। প্রাচীন মেক্সিকোয় পৃথিবীর দেবী হলেন চন্দ্র। জার্মান দেবী নের্থাস ছিলেন পৃথিবী মাতা, যেমন রহী ছিলেন গ্রিক বিশ্বাস মতে দেবী বসুন্ধরা। হিন্দু শাস্ত্রে ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি পুরুষ দেবতা থাকলেও বেদে পৃথিবীকে মা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কালিকা পুরাণে পৃথিবী দেবী জগদ্ধাত্রী। উপনিষদে কালী, করালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি দেবীর-নাম পাওয়া যায়।

কালী, দুর্গা ইত্যাদি শক্তি দেবীর আরাধনায় তন্ত্রের বড়ো ভূমিকা আছে। তন্ত্র সাধনার একটি দিক বৌদ্ধ দোঁহা-কোষ ও চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়ে শাক্তগীতি পদাবলীতে আশ্রয় নিয়েছে। শাক্তগীতির দুটি দিক, একদিকে দেবী হলেন উমা। তাঁকে কেন্দ্র করে আগমনি বিজয়ার গান শোনা গেল। আর অন্য দিকে শ্যামাকে কেন্দ্র করে জগজ্জননীর রূপ, ভক্তের আকুতি ধ্বনিত হয়।

বৈদিক সাহিত্যে 'কালী' নামটি মুণ্ডক উপনিষদে পাওয়া যায়— 'কালী করালী মনোজবা চ/সুলোহিতা যা চ সুধুম্রবর্ণা/স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী/ লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।' মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বে বর্ণিত দেবী কালিকা হলেন রক্তলোচনা, ভয়ংকরী। ফলে ভয়ংকরী দেবী চামুণ্ডা ও দেবী কালিকা যেন একই হলেন। কালিকা, চামুণ্ডা কীভাবে পরমেশ্বরী মহাদেবীর সঙ্গে একাত্ম হলেন, তা জানা যায় প্রখ্যাত গবেষক শশিভূষণ দাশগুপ্তের লেখায়—

'ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য হিমালয়স্থিতা দেবীর নিকট উপস্থিত হইলে দেবীর শরীর কোষ হইতে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন, সেই জন্য সেই দেবী কৌশিকী নামে লোকে পরিগণিতা হইলেন। কৌশিকী দেবী এইরূপে দেহ হইতে বহির্গতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলেন। এই জন্য তিনি হিমাচলবাসিনী কালিকা নামে সমাখ্যাতা হইলেন।'

কালী রূপের নানা বিবর্তন আমরা পাই। কালীর এক পা মহাদেবের বুকের ওপর। মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হয়েছে যে দেবী কালী শিবারূঢ়া না হয়ে শবারূঢ়া। অসুরনাশিনী দেবীর অসুরের শবকে দলিত করেন। শাক্তকবি রামচন্দ্র দাসের গানে শোনা গেল 'শিব নয় মায়ের পদতলে/ওটা লোকে মিথ্যা বলে/মায়ের পাদস্পর্শ দানব দেহ/শিবরূপ হলো রণস্থলে।' দেবী কালিকাকে নিয়ে দর্শন ও ধর্ম ব্যাখ্যায় বৈচিত্র্য আছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হয়েছে যে দেবী কালিকা সমস্ত প্রাণীকে কলন করেন বলেই তিনি মহাকালী। তিনি আবার নিজেই মহাকালকে কলন করেন বলেই আদ্যা পরম কালিকা। তিনি কালস্বরূপা ও আদিভূতা। মহানির্বাণ তন্ত্রে মহাদেবের মুখে বলা হয়েছে 'সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন বলিয়া এবং কালদন্তের দ্বারা চর্বণ করেন বলিয়া তাহাদের রক্ত সমূহ এই দেবেশ্বরীর বসনরূপে বলা হইয়াছে। সময়ে সময়ে বিপদ হইতে জীবকে রক্ষণ এবং স্ব স্ব কার্যে প্রেরণই দেবীর বর ও অভয় বলিয়া ভাষিত।'

বঙ্গে কালীপূজার কথা প্রথম পাওয়া যায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার গ্রন্থে। কৃষ্ণানন্দ সম্ভবত ষোড়শ শতকের

With Best Compliments from :

PIONEER PAPER AND STATIONERY PVT. LTD.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

NATIONAL HEALTH MISSION
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন

উচ্চরক্তচাপ, মধুমেহ (ডায়াবেটিস) এবং ক্যান্সার রোগ প্রতিহত করতে সচেষ্ট হোন

- অসংক্রামক রোগসমূহ যেমন উচ্চরক্তচাপ,মধুমেহ (ডায়াবেটিস) এবং স্তন, জরায়ু-মুখের ও মুখগহ্বরের ক্যান্সার রোগ বর্তমানে অকাল মৃত্যুর মূল কারণ।
- কতগুলি ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যা যেমন অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা, প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর আহার, চর্বি জাতীয় খাবারের আধিক্য, শারীরিক অলসতা, তামাক সেবন, অত্যধিক মদ্যপান এবং মানসিক চাপ অসংক্রামিত রোগের মূল উৎস। এই ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যাগুলি উত্তরোত্তর জনগণের মধ্যে বেড়ে চলেছে।
- একজন লোককে প্রাথমিকভাবে একনজর দেখলে তাকে স্বাস্থ্যবান মনে হতে পারে কিন্তু তার মধ্যেও এই রোগগুলি থাকতে পারে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে বছরে অন্তত একবার রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করানো উচিত।
- যদি এই সমস্ত রোগ শুরুতেই নির্ণয় করা যায় এবং সঠিক চিকিৎসা করা হয় তবে সুস্থ এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি।
- এই কর্মসূচীর অর্থাৎ NPCDCS প্রোগ্রামের প্রধান বিষয় হচ্ছে ত্রিশ বছরের উর্ধ্বে সন্দেহজনক প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলাকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় এনে বাছাইপর্ব সম্পাদন করা এবং সন্দেহজনক রোগীদের নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ কমিউনিটি হেলথ সেন্টার/ জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।
- ক্রমবর্ধমান অসংক্রামিত রোগের হারকে হ্রাস করা সম্ভব যদি প্রথম থেকেই কার্যকরি প্রতিরোধ ব্যাবস্থা গড়ে তোলা যায়।

ক্যান্সার ডায়াবেটিস, কারডিওভাসকুলার ডিজিজ এবং স্ট্রোক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি **(NPCDCS)**.

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

With Best Compliment From

Our Services

- Patent
- Copyright
- Trademark

itag
POWER OF IDEAS

Your IP Partner
ITAG BUSINESS SOLUTIONS LTD
+91 80170 37767

সাধক। এই গ্রন্থে কালী ছাড়াও তারা, ষোড়শী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধনরীতির উল্লেখ আছে। দীপাবলি উৎসব কেন্দ্রিক শ্যামাপূজার কথা সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ১৭৬৮-তে কাশীনাথ রচিত কালী পর্যাবিধি গ্রন্থে। দুর্গাপূজা বঙ্গদেশের প্রাচীন ও প্রধান পূজা হলেও তা নিত্য পূজা নয়। কিন্তু কালী নিত্য পূজিতা। দুর্গাপূজায় উৎসব প্রাধান্য পায় বলে সাধনার জন্য কালী ও দশ মহাবিদ্যার দেবীগণ প্রাধান্য পান।

বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থে আবার কালীকে পার্বতী, উমা, দুর্গা, গৌরী, চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্নভাবে দেখানো হয়। সৌরপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শিব পুরাণ ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে যে দক্ষকন্যা সতী পতি নিন্দার জন্য দেহত্যাগের পর পুনরায় শিবকে পতিরূপে পাওয়ার অভিলাষে হিমালয়-মেনকা কন্যা রূপে পার্বতী কালীরূপে তপস্যা করেছিলেন। পদ্মা পুরাণের সৃষ্টি তত্ত্বে বলা হয়েছে শিব পার্বতীকে কালভুজঙ্গিনী রূপে বর্ণনা করলে কুপিতা দেবী কৃষ্ণত্বক ত্যাগ করেন। পদ্মা পুরাণ মতে এই কৃষ্ণবর্ণা দেবী কৌশিকী। কৃষ্ণত্বক ত্যাগের পর তিনি গৌরী হন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বর্ণনা অনুযায়ী দেবীর দেহ থেকে কৌশিকী দেবী নির্গতা হলে দেবী কৃষ্ণবর্ণা হয়ে কালিকা রূপে কীর্তিকা হলেন। দেবী কালিকা কৃষ্ণবর্ণা, মহাঘোরা এবং দৈত্যদলনী। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেবী দুর্গা কালিকা হিসেবেই অভিহিত।

এখন কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রিতে যে কালীমূর্তি পূজিতা হন, তার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ত্রয়োদশ শতকের বৃহদ্ধর্ম পুরাণের। সম্ভবত চতুর্থ শতকে দেবী দুর্গার সঙ্গে কালীর অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। দেবী কালীর বরাভয় রূপের বর্ণনা আছে বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণে এবং কালীর এই রূপ হলো ভদ্রকালী। বঙ্গদেশে পূজিতা দেবী কালিকা হলেন করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা ও মুণ্ডমালাভূষিতা। বাম হস্ত যুগলের অধোহস্তে সদাচ্ছিন্ন শিব, ঊর্ধ্ব হাতে খড়্গ, দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, ঊর্ধ্ব হস্তে বর। মহা মেঘ বর্ণের মতো শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী। দেবী কালিকা চতুর্দিকে ঘোররবকারী শিবাকুলের দ্বারা সমন্বিতা। শশি-সূর্য-অগ্নি দ্বারা কালকৃত জগৎ সম্যক দর্শন করেন বলেই তিনি ত্রিনয়না। একাদশ শতাব্দীর কালিকা পুরাণে কালীর মনোরম রূপের বর্ণনায় তাঁকে খড়্গাধারিণী ও নীলপদ্ম ধারিণী বলা হয়েছে। এ সময়ের একটি ভাস্কর্যেও দুর্গা ও কালীর সমন্বয় দেখা যায়।

দেবী কালীকে নিয়ে নানা দার্শনিক মত রয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে কালীকে অগ্নির একটি কলা বলা হয়। কাল বা ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের পত্নী হিসেবে তিনি কালী। কাল বা সময়ের দেবী তিনি। মহাকাল বা শিবের বুকে দণ্ডায়মান কালী সৃষ্টি ও ধংসের দেবী। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কালী সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারিণী। ত্রয়োদশ শতক বা তার আগেই প্রচলিত কালীমূর্তির রূপ গড়ে উঠেছে।

জৈনকল্প সুত্রানুযায়ী কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রিতে মহাবীরের প্রয়াণকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে দীপ প্রজ্বলিত করা হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকের বৃহদ্ধর্ম পুরাণে সেই অমাবস্যাকে দীপান্বিতা বলা হয়। দীপান্বিতা কালী শিবের ওপর দণ্ডায়মান হয়ে বিশ্বকে অভয় দেন।

ভারতীয় সাধনায় তন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তন্ত্র সাধনার সাতটি আচার হলো বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। তন্ত্র সাধনার দেবী হলেন কালী। অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য যে যোগ সাধনা করা হয় তার সঙ্গে তন্ত্রের রয়েছে সুগভীর যোগ। যোগের সাহায্যে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা সাধক চৈতন্য লাভ করেন। তন্ত্রের সাধনা মহাশক্তির সাধনা 'এই মহাশক্তি সৃষ্টি করয়িত্রী, পালয়িত্রী আবার বিশ্বনাশীও বটে'। তিনি সগুণা, নির্গুণা, সাকারা, নিরাকারা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ সক্রিয়। প্রখ্যাত সমালোচক ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় 'সৃষ্টি লীলাচঞ্চলা কালী, আর সৃষ্টির অতীত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ও প্রশান্ত ধীর স্থির শিব।'

শাক্তসংগীতও মন্ত্র, তাই নিছক যোগ সাধনার মন্ত্র রূপ নয়, এ হলো ভক্তির স্রোতধারা। শাক্ত সাধকদের কাছে কালী হলেন ব্রহ্মরূপা, সনাতনী। দেবী কালিকা মায়া দ্বারা ত্রিগুণময়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তন্ত্রে যে দেবী চামুণ্ডা, কালী, করালবদনা, আরক্তনয়না সেই দেবীই শাক্ত সাধকদের অমর সৃষ্টিতে বঙ্গদেশের ঘরের মেয়ে শ্যামা। দেবী হলেন উপাস্যা, আরাধ্যা, কন্যা। ধর্ম ও সংস্কৃতির এত সমুন্নত রূপ সনাতন ধর্মের বিস্তৃতি ও সহনীয়তাকেই মনে করিয়ে দেয়। শ্যামাসংগীত বাঙ্গালির পারিবারিক মধুর জীবনকথা। দেবী কালিকা তখন বাঙ্গালি ঘরের মানবী। তরুণ কুমার বসুর পর্যবেক্ষণ তাই অতিগ্রহণীয় হয়ে উঠে— 'অষ্টাদশ শতকে কালিকা তন্ত্রের সর্বাত্মক বিজয়ের দিনেই সাধকের রক্তচক্ষুতে একই ব্রহ্মের নানা রূপ, পরমকারণের দুর্জ্ঞেয় রহস্যে শ্যামা-উমার অভিন্নত্বের মতো শ্মশানবাসিনী ও বৃন্দাবনবিহারীর স্থির ঐক্যরূপ নিঃসংশায়িত রূপে স্থাপিত হয়েছে।' ভক্তের চোখে শ্যাম ও শ্যামা অভিন্ন। ভগবান কৃষ্ণ যেমন ধ্বংস ও সৃষ্টি রহস্য ভেদ করেন, তেমনই দেবী কালিকা মহাকালের প্রেক্ষিতে সৃষ্টির প্রবাহকে বজায় রাখেন। সনাতন ধর্মে কালী তাই কালোত্তীর্ণ মহাকালী। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

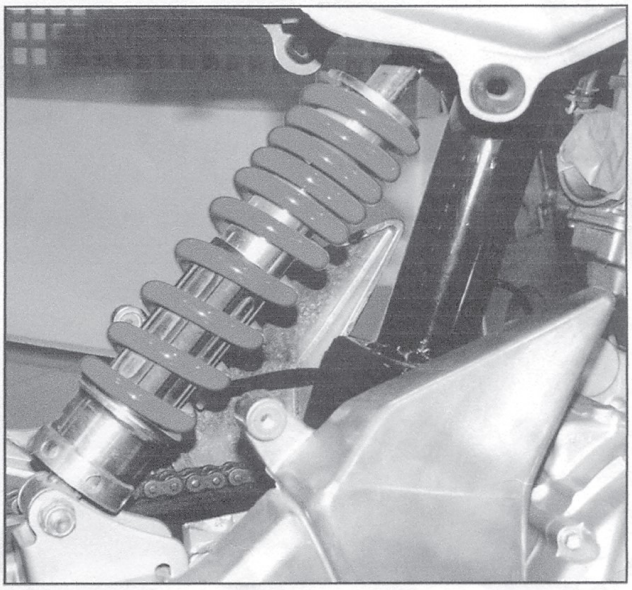

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- Struts/Gas Struts
- Shock Absorbers
- Front Forks; and
- Gas Springs

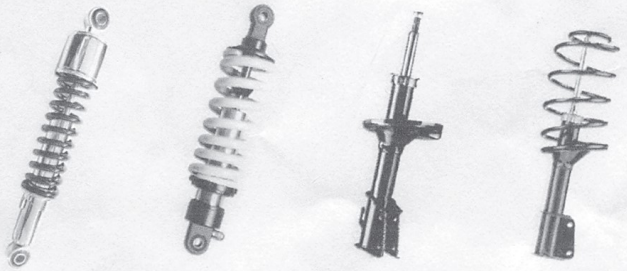

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত

দুলালের®

তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।

সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street

4th Foor, Kolkata - 700 069

Phone : Nos. 22483203

Fax No. 22483195

Email : eita.cal@eitain.com

With Best Compliments from :

SINGHANIA & CO.

7B, Kiransankar Roy Road

2nd Floor, Kolkata - 1

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

32, Ezra Street, Room No. 854, Kolkata - 700 001

Phone (O) 40086996